অতীতের ব্রাহ্ম সমাজ

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

(অনেকগুলি প্রতিকৃতি সহিত)

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দেব প্রণীত

কলিকাতা
১৯২১ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভূমিকা।

ব্রহ্মকৃপা যখন মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, তখন মানব অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে। আমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাবি নাই যে, আমার জরাজীর্ণ শেষ-জীবনে অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত লিখিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিব। তবে কেন এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহা বলিতেছি। আমি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দুইটী ফল লাভের আশায় কলিকাতাস্থ কলেজস্কয়ারে প্রাতঃসন্ধ্যা ভ্রমণ করি। প্রথম ফল স্বাস্থ্যরক্ষা, দ্বিতীয় ফল সমবিশ্বাসী ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে করিতে ভ্রমণ। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভাপতি কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আমাকে বলিলেন, "আমি কল্য একটী ব্রাহ্মের গৃহে গিয়াছিলাম, সেই গৃহস্বামী আমাকে অনুরোধ করিলেন যে, আগেকার ব্রাহ্ম-সমাজ কি প্রকারে গঠিত হইয়াছিল তাহার একটী ইতিহাস সরল ভাষায় লেখার বিশেষ দরকার হইয়াছে, কারণ, বর্ত্তমানে আমাদের পুত্রকন্যাগণ অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তাহাতে আমি উত্তর দিলাম, "আমি বিশেষ চেষ্টা করিব"। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবাবু এই সকল কথা বলিয়া আমাকে বলিলেন, "দেখুন, আগেকার লোকসকল একে একে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, আপনাকে অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে"। আমি বলিলাম, "আপনি পাগল হইয়াছেন। আমার বৃদ্ধাবস্থায় স্মরণশক্তি হ্রাস হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে জানি না, আমি এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম।" তিনি নাছোড়বান্দা হইলেন। কিছুতেই তাঁহার হাত এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া

স্বীকার করিলাম। আমি এই ভার গ্রহণ করিয়া গুরু চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমি বামন হইয়া চন্দ্র স্পর্শ কেমন করিয়া করিব, দিবারাত্র কেবল এই চিন্তা। তৎপরে ব্রহ্মকৃপার জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা এবং অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজের ভক্ত-চরিত্র আলোচনা, এই উভয় সাধনায় আমার প্রাণে যখন একটু একটু শক্তি সঞ্চারিত হইতে লাগিল, তখন এই পুস্তকখানি লিখিতে আরম্ভ করিলাম। একদিকে ব্রহ্মকৃপা অপর দিকে অতীতের ভক্তদিগের আশীর্ব্বাদে, দুই বৎসরব্যাপী পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া যদি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ও ব্রাহ্ম-সমাজের হিতৈষীদিগের প্রাণে নবশক্তি জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমার শেষ জীবনের সাধনার ফল সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজের হস্তলিপি পুস্তকখানি শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় মধ্যে মধ্যে দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়া, আমার মহোপকার করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তৎপরে শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ সীতানাথ দত্ত মহাশয়, এই হস্তলিপিখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহার নিকটও চিরঋণী রহিলাম। সর্ব্বশেষে শ্রদ্ধাস্পদ বরদাকান্ত বসু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগ্রহের সহিত এই পুস্তকখানির মুদ্রাকর ভুলসকল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তাঁহাকেও হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিলাম। এই সংস্করণে ভুল ত্রুটী অনেক লক্ষিত হইবে, ভবিষ্যতে সুযোগ ঘটিলে তাহা সংশোধন করা যাইবে।

কলিকাতা,
১৪নং এণ্টনিবাগান লেন। — গ্রন্থকার

উৎসর্গ।

যিনি নানা লোকগঞ্জনা অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে ভক্ত উমেশচন্দ্রের
চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই পরলোকগতা পরমরাধ্যা
জননী এবং যিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে লালনপালন করিয়া,
জ্ঞান প্রেম ও ভক্তির পথ দেখাইয়া দিয়া ব্রাহ্ম-
সমাজে আনিয়াছিলেন সেই ভক্ত উমেশচন্দ্র,
এই উভয়ের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া
আজ এই ব্রাহ্ম-সমাজের
অতীতের ইতিহাস তাঁহাদের
চরণে ভক্তি-কৃতজ্ঞতার
সহিত উৎসর্গ
করিলাম।

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী—
ত্রৈলোক্য

ব্রহ্মানন্দ দর্শন।

আমার দীক্ষাগুরু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আজ ৩৭ বৎসর কাল স্বর্গারোহন করিয়াছেন। আমি "অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজ" পুস্তকখানি লিখিয়া প্রেসে ছাপাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি, এমন সময়ে ১৯২১ সালের ৮ই আগষ্ট, সোমবার রাত্র প্রায় ৩টার সময়, সেই মহাপুরুষ আসিয়া স্বপ্নে দেখা দিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। "ত্রৈলোক্য, তুমি যে পুস্তকখানি লিখিয়াছ তাহা শীঘ্র শীঘ্র ছাপাইয়া প্রকাশ কর, ইহাতে ব্রাহ্ম-সমাজের খুব উপকার হইবে"। আমার কি সৌভাগ্য! এতদিন পরে সেই সৌম্যমূর্ত্তি শান্তপ্রকৃতি মহাপুরুষকে দর্শন করিলাম!

সূচিপত্র।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠা	...	১
আত্মপরিচয়	...	৮
আদি সমাজ ও মহর্ষি দেব	...	৯
কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজ গঠন	...	১৫
অতীতের প্রচারকগণ	...	১৭
সমাজমন্দির গঠন	...	২০
ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্রের চিন্তা	...	২৬
ব্রাহ্মনিকেতন	...	৩৬
অতীতের প্রচারক পরিবার	...	৩৯
প্রচারকগণ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	...	৪১
ব্রহ্মানন্দের ক্ষমা ও ধৈর্য্য	...	৪৪
ব্রহ্মানন্দের প্রভাব ও সাধনা	...	৪৬
প্রেম ভক্তির আদান-প্রদান	...	৪৮
অতীতের ব্রাহ্মচরিত্র	...	৫১
একটী নির্লোভ ব্রাহ্মচরিত্র	...	৫৩
অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজ কি কি কার্য্য করিয়াছেন	...	৫৬
রামকৃষ্ণ পরমহংস ও ব্রাহ্ম-সমাজ	...	৬৫
শিবনাথ ভট্টাচার্য্য	...	৭৮
উমেশচন্দ্র দত্ত	...	৯১
পরিশিষ্ট	..	১২৩

ওঁ
ব্র
হ্মা
রামমোহন
ব্র
হ্ম
দেবেন্দ্রনাথ
কেশবচন্দ্র

ওঁ

অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠাতা।

যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও অগ্রণী, যাঁহাদিগের চরণপ্রান্তে বসিয়া এবং যাঁহাদের মুখ-নিঃসৃত ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিয়া কত পাপী তাপী পরিত্রাণ লাভ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নিজের ধনৈশ্বর্য্য, পদমর্য্যাদা পরিত্যাগ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়া জীবন্ত বিশ্বাস, বিমল ভক্তি ও পুণ্যজীবন দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজরূপ বৃক্ষটীকে ফুল ফলে সুশোভিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন।

দেবেন্দ্রনাথ।

যিনি ব্রহ্মাজ্ঞা শিরোধার্য্য, শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন ও শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া এই মহানগরীতে ব্রহ্ম-বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন সেই রাজা রামমোহন এখন কোথায়?

যিনি ধ্যানস্তিমিতাবস্থায় ব্রহ্মানন্দরসে মগ্ন হইয়া, দরদরিত ধারে প্রেমাশ্রু বর্ষণ দ্বারা রামমোহনের প্রোথিত ব্রহ্ম-বীজ বৃক্ষ-রূপে পরিণত করিয়াছিলেন, যিনি এই জগতে সত্যের অন্বেষণ ও স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পূজনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এখন কোথায়?

কেশবচন্দ্র।

রাজনারায়ণ।

যিনি উজ্জ্বল বিশ্বাস, অদম্য উৎসাহ ও ব্রহ্মানন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক এই ব্রাহ্মসমাজরূপ বৃক্ষকে ফল ফুলে সুশোভিত করিয়া, ইহাকে আধ্যাত্মিক পরিবারে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এখন কোথায়?

মহর্ষিদেবের সেই আজীবন বন্ধু, যিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা এবং নানা ধর্ম্মমতের গবেষণায় চিরজীবন অতিবাহিত করিয়া এই বঙ্গদেশে অতুল সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন

অতীতের প্রচারকগণ।

আমি যখন হরিনাভি হইতে ভক্ত উমেশচন্দ্রের সহিত কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলাম, তখন জোড়াসাঁকো আদি সমাজ ভিন্ন অন্য কোন সমাজ দেখি নাই। প্রচারকেরা পটলডাঙ্গা মাধববাবুর বাজারের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে হুকাপটীর উপর দ্বিতল বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। আমরা উভয়ে এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিতাম। প্রচারক মহাশয়দিগের রামপ্রসাদ নামে স্থূল ও খর্ব্বকায় একটী ভৃত্য ছিল। সে পাচক ও চাকরের কার্য্য করিত। তখন কলুটোলায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ত্রিতল গৃহে প্রতিদিন প্রাতে ৮টার সময় উপাসনা হইত। সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল সঙ্গীত করিতেন এবং ব্রহ্মানন্দ উপাসনা করিতেন। প্রচারকগণ ঠিক ৮ টার পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে উপস্থিত হইতেন। যাইবার সময় স্বর্গগত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় রাম-প্রসাদকে ডাকিয়া যে কয়েকজন আহার করিবেন প্রত্যেকের জন্য এক আনা হিসাবে পয়সা দিয়া যাইতেন। আর আমরা যে দিন থাকিতাম, আমাদের জন্য রামপ্রসাদকে দুই আনা দিতাম। রামপ্রসাদ ঠিক একটার পূর্ব্বে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিত। প্রচারকগণ যখন প্রত্যাবৃত্ত হইতেন তখন রামপ্রসাদ সারি সারি কদলাপত্রে অন্ন ব্যঞ্জন সাজাইয়া দিত। ভাত, ডাল, ভাজা, না হয় ডালনা ও অম্ল হইত। আমি দেখিয়াছি, প্রচারকগণ এই প্রকার আহারে সন্তুষ্টচিত্তে দিনপাত

করিতেন। জলখাবারের সময় মুড়ি খাইতে দেখিতাম। রামপ্রসাদ বড় সরল প্রকৃতির লোক ছিল। এক এক দিন এমনও দেখিয়াছি যে, কান্তিবাবু উপাসনায় যাইবার সময় রামপ্রসাদকে ডাকিয়া বলিতেন যে আজ আর টাকা পয়সা নাই, আজ আমরা আহার করিব না। রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিত, সে কি মহাশয়? আমি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিব, যখন টাকা আসিবে তখন দিবেন। আমি অনেক সময় ভক্ত উমেশচন্দ্রের নিকট শুনিতাম যে, প্রচারকগণ অর্থাভাবে সময়ে সময়ে অনাহারে দিনপাত করিতেন। এই ত গেল তাঁহাদের আহারের কথা। তার পর শয়নের কথা—একদিন আমি ও ভক্ত উমেশচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের বাটী হইতে রাত্রি ১১টার সময় প্রচার কার্যালয়ে আসিয়া দেখিলাম যে, প্রচারকগণ আহার করিতে বসিয়াছেন। ইতিমধ্যে কান্তিবাবু আমাদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের আহার হইতে কিছু অংশ আমাদিগকে প্রদান করিলেন। তৎপরে তাঁহারা আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিতে গেলেন। সম্মুখে একটা ঘরে মাদুর পাতা, তাহাও আবার শেষ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে; বালিস নাই, তোষক নাই, মশারি নাই। আমি ইহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভক্ত উমেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা এই প্রকার বিছানায় কেমন করিয়া শয়ন করিবেন? তিনি বলিলেন, (আমার বেশ স্মরণ আছে) "এই সকল প্রচারকগণ নিজ নিজ চাকরী এবং সুখস্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় জীবন দান করিয়াছেন"। আমি তাঁহার নিকট হইতে দুই একটী প্রচারকের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। আমি তখন প্রথম ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি, ধর্ম্মের মধুর আস্বাদ

অনুভব করিতে পারি নাই। তৎপরে দেখিলাম যে, সেই ছিন্ন মাদুরের উপর কেহ একখানি পুস্তক, কেহ একখানি ইষ্টক, কেহ বা নিজের গাত্রবস্ত্রখানি মুড়িয়া উপাধান রূপে ব্যবহার করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন। আমার ত সমস্ত রাত্রি মশকের দংশনে নিদ্রা হইল না। এই ত গেল তাঁহাদের আহার ও শয়নের ব্যবস্থা। পরিচ্ছদের কথা আর কি বলিব! যাহা দেখিয়াছি তাহা এখন লিখিতে বড় কষ্ট হয়। আপনারা বুঝিয়া লইবেন যে, কি প্রকার বেশভূষায় ভূষিত হইয়া তাঁহারা এই কষ্টকর প্রচারক-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। অতীতের প্রচারকগণ নিজ স্বার্থ ও সুখেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে কত সুখ ও শান্তির স্থান করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

সমাজ-মন্দির গঠন।

যেমন দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হইতে লাগিল, ব্রহ্মানন্দের উপাসনার গভীরতা, মধুরতা ও আধ্যাত্মিকতার ভিতর প্রচারকগণ ও উপাসকমণ্ডলী এমনই মগ্ন হইতে লাগিলেন যে, তাঁহারা ব্রহ্ম-ধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দরসপানের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মানন্দের মধ্যে অসাধারণ ব্রহ্মশক্তি যেমন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, তেমনি দলে দলে লোকসকল আসিয়া উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মানন্দের ঘরে ও বাহিরে স্থান নাই, সকলে ভিখারীর ন্যায় তাঁহার মুখের দুইটা কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল-হৃদয়ে পথে ও তাঁহার ত্রিতল গৃহের সিঁড়িতে দাড়াইয়া থাকিতেন। আহা! ব্রহ্মের জন্য মানবাত্মার ব্যাকুলতার কি দৃশ্য দেখিয়া-ছিলাম তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

কিছু দিন হইতে ব্রহ্মানন্দ, প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি প্রচারকগণ ও ব্রাহ্মসমাজের শুভানুধ্যায়ী, উৎসাহশীল ও ধর্ম্মপিপাসু অন্যান্য ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া একটী সাধারণ উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ করিতেছিলেন। কিন্তু অর্থ কোথা হইতে আসিবে? "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়", এই মূল মন্ত্র সকলে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটের উপর একখণ্ড জমী দেখা হইল। ঐ জমীটি সকলের পছন্দ হইল। সেই সময়ে উপাসকমণ্ডলীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছিল। সকলে প্রতি মাসে আংশিক রূপে এক এক মাসের উপার্জ্জিত আয় দিতে স্বীকৃত হইলেন। অতি অল্প

দিনের মধ্যে কিছু টাকা সংগৃহীত হইল। প্রথমে জমীটি ক্রয় করা হইল। উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে যাহারা ধনী ছিলেন, তাঁহারা অধিক পরিমাণে অর্থ দিয়া মন্দির নির্ম্মাণের সাহায্য করিলেন। প্রথমে জমীর উপর চন্দ্রাতপ খাটাইয়া ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং ভিত্তি স্থাপন করিলেন। পরে কর্ম্মবীর প্রচারক অমৃতলাল বসু মহাশয় মন্দির-নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা দ্বারা নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা করিলেন। ১৮৬৯ সালে উহার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দির নামকরণ হইল; এবং ব্রহ্মানন্দ মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন। তখন উপাসকমণ্ডলী আনন্দে ও আরামে ভগবানের নাম সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে যুবক শিবনাথ ব্রহ্মমন্দির সম্বন্ধে একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন; এই অমূল্য কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

মন্দির

১

বিজয়-নিশান তুলে,
আনন্দ-বাজার খুলে,
কোথা হ'তে এলে তুমি অমৃতের ঘর হে;
তোমাকে দেখিয়ে কেন জুড়ায় অন্তর হে?
মাদৃশ পাপীর তরে
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে,
দীন হীন ভিখারীতে তোমাকে যে তুলিল!
কি মধুর প্রেম-রাজ্য প্রকাশিত হইল!

২

দয়াময়-নাম গান
করিয়া জুড়াব প্রাণ,
বলে কি, মন্দির, তুমি নিজ দ্বার খুলিয়া,
বসিলে সহাস্য মুখে জয়-কেতু তুলিয়া ?
অনাথ সন্তানগণে,
স্থান দাও শ্রীচরণে,
বলে, সবে এত কাল পথে পথে কাঁদিনু,
তাই কি, মন্দির, আজ তোমাকে হে পাইনু ?

৩

জয় হে তোমার জয়,
জয় সেই দয়াময়,
যাঁর দয়া প্রচারিতে প্রকাশিত হইলে,
সহস্র কাতর জনে নিজ কোলে লইলে !
ছিনু মোরা নানা স্থানে,
আহা ! কি মধুর টানে
টানিয়া আনিলে তুমি ! লোকে ভেবে পায় না,
সংসারের দিকে মন আর কেন ধায় না !

৪

বাল বৃদ্ধ নারী নর,
শুনিয়া তোমার স্বর,
পাগল হইয়া সবে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল,
যাহারা নিদ্রিত ছিল চমকিয়া উঠিল !
মত্ত হ'য়ে নিজে ধায়,
অন্যে বলে আয় আয় ;

এ কি চমৎকার কাণ্ড, প্রকাশিত করিলে !
এমধুর ভাব তুমি কোথা হ'তে আনিলে ?

৫

তোমার নিকট যাই,
কত যে আনন্দ পাই,
আনিয়া বিলাই ঘরে, যারে দেখা পাই হে !
পিতা মাতা বন্ধু গণে,
কাঁদেন হতাশ মনে,
তোমাকে, মন্দির, তবু ছাড়িতে যে চায় না ;
প্রাণ টানে তোমা পানে, অন্য দিকে যায় না।

৬

হে মন্দির, কার তরে
এত সুখ পরিহরে,
এলাম পাগল হ'য়ে, বন্ধুগণে কাঁদায়ে,
কেন দিনু সব সুখ একেবারে ভাসায়ে !
পিতা হন অপমান,
মাতার অস্থির প্রাণ ;
পূর্ণ আমাদের ঘর সবাকার রোদনে,
এমন নৃশংস কাণ্ড করি কার কারণে !

৭

হৃদয়ে রাখিয়া যারা
যতনে পালিল, তারা
পর হলো, তুমি হ'লে এমনি আপন হে !
সকল ছাড়িয়া এনু তোমার কারণ হে !

কষ্ট শোক পায়ে ঠেলে,
তোমার নিকট এলে,
পবিত্র মন্দির, তুমি কি বা ধন দিবে হে!
বাহু প্রসারিয়া বুঝি কোলে করে নিবে হে!

৮

ইষ্টক-নির্ম্মিত তুমি,
দেখিতে সামান্য ভূমি,
কি আছে তোমাতে হেন, প্রাণ যার তরে হে,
না হয় সুস্থির কভু, হান টান করে হে!
যে ধনের আশা দিয়া,
স্নেহ-জাল কাটাইয়া
আনিলে, মন্দির, দাও সেই ধন আনি হে;
দেখাই সকলে, নিজে ধন্য বলে মানি হে!

৯

তোমার আশ্রিত যারা,
কেন, হে মন্দির, তারা
প্রীতির আস্পদ এত! তাহাদিগে দেখিয়া,
আনন্দ-রসেতে প্রাণ যায় কেন গলিয়া!
বাজাও বিজয়-ভেরী,
স্বর্গ মর্ত্ত্য যাক্ পূরি,
মধুর দয়াল নাম বহে যাক্ পবনে;
হেন শুভ সমাচার যাক্ প্রতি ভবনে।

১০

নিজ ধনে ধনী যারা,
সুখেতে থাকুক তারা,

দরিদ্রের বন্ধু তুমি, তাহাদিগে ডাক হে ;
দরিদ্র লইয়া তুমি চির কাল থাক হে !
আজি মোরা গুটি কত
পথের ভিখারী যত,
হে মন্দির, তব কোলে রহিয়াছি পড়িয়া ;
কিন্তু কালে হেন দশা যাবে যাবে চলিয়া।

যুবক শিবনাথের প্রাণে সেই সময়ে কি এক আশ্চর্য্য ব্রহ্ম শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি তৃণ কাঠ ও ইষ্টক নির্ম্মিত ব্রহ্মমন্দিরকে সম্বোধন করিয়া উপরের লিখিত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন! তাহার প্রত্যেক পংক্তি প্রাণ পাগল করিয়া তোলে। অতীতের ব্রাহ্মসমাজে যে প্রেম ভক্তির স্রোত উৎসারিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভাসাইয়া দিয়া উক্ত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। তিনি ঐ কবিতাটির এক স্থানে লিখিয়াছিলেন—কি সুন্দর প্রেমের বিকাশ!—

"তোমার আশ্রিত যারা,
কেন, হে মন্দির, তারা
প্রীতির আস্পদ এত! তাহাদিগে দেখিয়া,
আনন্দ-রসেতে প্রাণ যায় যেন গলিয়া।"

কি মধুর প্রেমের উৎস এই কবিতাটির ভিতর প্রবাহিত হইতেছে! আমি দেখিয়াছিলাম, যখন মন্দিরের উপাসনা শেষ হইত, তখন অনেক ব্রাহ্ম এমন ভাবে মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরস্পরে ধর্ম্মালাপ করিতেন, যেন কেহ কাহাকেও ছাড়িতে চাহিতেন না।

ব্রাহ্ম সমাজ ও কেশবচন্দ্রের চিন্তা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বেশী কথা কহিতেন না। স্ত্রী জাতির উপর শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁহার চরিত্রের একটী স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মস্তক তুলিয়া কথা কহিতেন না। সর্ব্বদাই ব্রহ্মচিন্তাতে মগ্ন থাকিতেন। আমি ভক্তগণের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি ঈশ্বরাদেশে সকল কার্য্য করিতেন। আমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিয়া দেখিতাম যে, যখন তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, তখন তিনি এক এক সময়ে ছুরীখানি লইয়া নখ চাঁচিতেন এবং পার্শ্বে যে এক খণ্ড কাগজ থাকিত তাহাতে কি সকল লিখিয়া রাখিতেন। আবার সময় সময় দেখিতাম, একটী পেন্সিল লইয়া কখন একটী পক্ষী বা জন্তু আঁকিতেছেন; কিন্তু অঙ্কন কার্য্য শেষ হইতে না হইতে সেই টুক্‌রা কাগজে কি সব লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার চিত্রবিদ্যায় স্বাভাবিক শক্তি ছিল।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, ব্রহ্মানন্দের চিন্তা অন্যদিকে ধাবিত হইল। তিনি ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দেখিলেন যে, নিরাকার পরব্রহ্মকে সকল শ্রেণীর উপাসকেরা কেবল জ্ঞানযোগে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজার্চ্চনা করিতে সহজে সমর্থ হইবেন না; এই হেতু ইহাতে প্রেম ও ভক্তি সংযোগ করা প্রয়োজন মনে করিয়া, চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত খোল

ও করতাল যোগে নামসংকীর্ত্তন ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তন করিলেন। যখন এই সংকীর্ত্তন প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, আমার বেশ স্মরণ আছে, হিন্দু ও খৃষ্টীয় সমাজের শিক্ষিত ভদ্রলোক-সকল নানা প্রকার ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে বলিতেন, "কেশব সেন ব্রাহ্মসমাজকে ন্যাড়া নেড়ীর দলে পরিণত করিতে চলিল"। এমন কি, আদি সমাজ হইতেও ঠাট্টা বিদ্রূপের বাণ কেশব বাবুর উপর বর্ষিত হইয়াছিল। আমি দেখিয়াছিলাম, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে নাম সংকীর্ত্তন প্রচলন করিবার কয়েক বৎসর পরে, খৃষ্ট ও আদি সমাজে খোল ও করতাল যোগে কার্ত্তনের সুরে সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাস্তবিক ঘৃণিত ন্যাড়া নেড়ীর দলে পরিণত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস বৈষ্ণব ধর্ম্ম কেশবচন্দ্র সেন দ্বারাই সংস্কৃত হইয়া সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মসমাজে কীর্ত্তনাঙ্গ সুরে সঙ্গীত প্রচলিত ছিল না। প্রথমে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় এবং বেহার প্রদেশীয় জামালপুর প্রবাসী পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি মহাত্মা কীর্ত্তনের সুরে সঙ্গীত রচনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পুণ্ডরীক বাবু স্বরচিত কীর্ত্তন, তাঁহার স্বাভাবিক সুকণ্ঠে যখন প্রেম ও ভক্তির সহিত গান করিতেন, তখন উপাসকগণ উন্মত্ত হইয়া চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিতেন না। এইরূপ সরস উপাসনা, সঙ্গত সভা ও সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সাধারণ উপাসকদিগের অন্তরে ধর্ম্মের জন্য এমন ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল যে, কলিকাতার কয়েকটি পল্লীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশ্বাসী চন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকটি লোকের

যত্নে বরাহনগরে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস ও সাধুচরণ দে প্রভৃতি কয়েকটি সাধু পুরুষের যত্নে চুনারীপুকুরে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইটালী বেনিয়াপুকুরেও একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন কয়েকটি স্বুবর্ণ বণিকের বাটীতে ব্রহ্মোপাসনার জন্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; যথা—পাথুরিয়া ঘাটায় জয়গোপাল সেন ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে; পটল ডাঙ্গায় কানাইলাল পাইন ও প্রেমচাঁদ বোড়াল মহাশয়ের বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সিন্দুরিয়াপটী ও নন্দনবাগানে পারিবারিক সমাজ ছিল। উহা অগ্রে আদি সমাজ ভুক্ত ছিল, পরে তাহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইয়াছিল। প্রচারকগণ প্রতি সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট দিনে যাইয়া এই সকল সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসিতেন। বাৎসরিক উৎসবের সময় প্রায়ই ব্রহ্মানন্দ ও প্রতাপচন্দ্র যাইয়া উৎসব কার্য্য সমাধা করিতেন।

অনেক দিন পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ, উপাসকগণ চরিত্র পরীক্ষা দ্বারা ব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে সঙ্গতসভা নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি এই সভার সভাপতি ছিলেন। উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদক ও হরগোবিন্দ চৌধুরী সহকারী সম্পাদক ছিলেন। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দের গৃহে এই সভার অধিবেশন হইত। এই সভায় সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইত। অনেক শিক্ষিত লোক ধর্ম্মালোচনার জন্য এই সভার সভ্য হইয়াছিলেন। সভ্যগণ যে সকল প্রশ্ন করিতেন ব্রহ্মানন্দ তাহার উত্তর দিতেন। উমেশচন্দ্র কেবল কেশবচন্দ্রের উত্তর গুলি লিখিয়া রাখিতেন; পরে "ধর্ম্ম-সাধন" নামক

একখানা ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রের আকারে উহা ছাপা হইয়া বিক্রয় হইত। আমি দেখিয়াছিলাম যে, প্রত্যেক সভ্যের নিকট একখানি করিয়া ডায়েরী অর্থাৎ প্রতিদিনের আত্মচিন্তা ও কার্য্যসম্বলিত পুস্তক থাকিত। সেই সকল সভ্যগণ সাধন ভজন করিবার জন্য এক একটা বিশেষ মণ্ডলী ভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম মণ্ডলী—প্রচারকগণ; দ্বিতীয় মণ্ডলী—উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু, হরগোপাল সরকার, ক্ষেত্রমোহন দত্ত, বসন্তকুমার দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ইনি এখনও জীবিত আছেন); তৃতীয় মণ্ডলী—রজনীনাথ রায়, সারদানাথ হালদার, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি; চতুর্থ মণ্ডলী—ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ দত্ত, সীতানাথ দত্ত, পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উৎসাহী ব্রাহ্ম এই সভার সভ্য হইয়া সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সঙ্গতসভার সভ্যগণের আধ্যাত্মিক প্রভাব শুধু যে কলিকাতায় আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে; মফঃস্বলেও এই সঙ্গত সভার প্রভাবে অনেক ব্রাহ্ম সাধক নামের অধিকারী হইয়াছিলেন।

এক দিকে ব্রহ্মানন্দের চিন্তা ও প্রচারকগণের অদম্য উৎসাহে নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং নগরে ও গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা; অপর দিকে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণজন্য নানা প্রকার কঠোর নির্য্যাতন ও স্বার্থ-ত্যাগ; এই উভয় শক্তি, ব্রহ্মকৃপার সহিত সম্মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব প্রেম ও ভক্তির নবধারা এই বঙ্গদেশে প্রবাহিত করিয়া, ধনী ও নির্ধন, বিদ্বান ও মূর্খ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সকলকে ভাসাইয়া

লইয়া হিন্দু সমাজকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা উপবীত পরিত্যাগ করিতে লাগিল, শিক্ষিত যুবকেরা জাতি-নির্ব্বিশেষে অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ করিয়া ব্রাহ্ম পরিবার প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া অনেক শিক্ষিত হিন্দুনাম-ধারী লোকদিগকে বলিতে শুনিতাম যে, "কেশব সেন, উইল সেন ও ষ্টেসণ" এই তিনটা একত্রিত হইয়া আমাদের দেশের জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট করিতে বসিয়াছে

যখন ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে ক্রমে নব নব পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তখন ব্রহ্মানন্দের চিন্তা, এই সকল পরিবারে নিয়মিত উপাসনা দ্বারা উহাদের ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে, বিশেষ রূপে সচেষ্ট হইয়াছিল। প্রচারকগণ প্রতিদিন বা সপ্তাহে সপ্তাহে এই সকল নব-প্রতিষ্ঠিত পরিবারে যাইয়া নিয়মিত উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করিয়া আসিতেন। ভক্ত উমেশচন্দ্রও অনেক ব্রাহ্ম পরিবারে অক্লান্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে এক অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

যাহারা সরল বিশ্বাস এবং ব্যাকুলতা লইয়া অতীতের ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা, সাধনা দ্বারা ব্রহ্ম-স্পর্শানুভব করিতে করিতে ভূমানন্দ-রস-প্রবাহে নিজের অস্তিত্বকে ভাসাইয়া দিয়া, এই ব্রাহ্মসমাজে ভূরি ভূরি স্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিতেছি। এই উদাহরণ দিবার অগ্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের এই কবিতাটি স্মরণ হইল।

"কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা,
যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন প্রাণ মান রে
পিতাকে ধরিয়া রব পর্ব্বত সমান রে"।

ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের স্বার্থ ত্যাগ—ইনি কলিকাতায় এক কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার এক-মাত্র সন্তান; কলিকাতায় ধনৈশ্বর্য্যে পূর্ণ বৃহৎ অট্টালিকা। ক্ষেত্রনাথ অপূর্ব্ব ব্রহ্ম-স্পর্শারাম হৃদয়ে অনুভব করিয়া, তাঁহার পিতার সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য পদদলিত করিয়া, অবিচলিত চিত্তে ধর্ম্মের জন্য ব্রহ্মে আপনাকে আহুতি দান করিলেন। তাহা এখন স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এখানে একটী ভক্তের সঙ্গীত আমার মনে পড়িল।

ঐ নামে ভুলায়েছ যারে, সে কি দূরে যেতে পারে,
ঐ নাম-রসে যে মজেছে, সে বুঝেছে কি আরাম।"

ক্ষেত্রনাথের পিতা তাঁহার একমাত্র পুত্রকে বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে উইল দ্বারা তাহা দান করিয়া গেলেন। ইহাতে ধর্ম্মবিশ্বাসী ক্ষেত্রনাথ বিচলিত হইলেন না, একবার ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

চিন্তাশীল কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মদিগকে সামাজিক পদ্ধতিতে আবদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। এবং প্রচারকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, পুস্তকাকারে প্রকাশ না করিয়া, মৌখিক রূপে লিখিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তন করিলেন। ব্রহ্মানন্দ এই অনুষ্ঠানপদ্ধতি ব্রাহ্মসমাজে প্রচলন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না। বর্ত্তমান ব্রাহ্ম বিবাহ আইনসঙ্গত কি না, তাহা মীমাংসার্থ তিনি কাশীস্থ বোপদেব শাস্ত্রী প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রীয় মত আনয়ন করিলেন। এবং বর ও কন্যার বয়স নির্দ্ধারণার্থ কলিকাতার মহেন্দ্রলাল সরকার ও চন্দ্রমোহন দে এম, ডি, প্রভৃতি প্রধান প্রধান ডাক্তারদিগের মত গ্রহণ করিয়া

বড়লাটের সভাতে "ব্রাহ্ম বিবাহ আইন" প্রচারের জন্য একখানি দরখাস্ত পাঠাইলেন এবং টাউন হলে একটী বিরাট সভার আয়োজন করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি কয়েকটী আদি সমাজের সভা একত্রিত হইয়া সেই সভাতে উক্ত বিধি প্রণয়নের প্রতিবাদ করায়, গভর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাশ না করিয়া সাধারণের জন্য ১৮৭২ সালের ৩ আইন নাম দিয়া একটী আইন পাশ করিলেন।

অতীতের সাধনপ্রিয় উপাসকগণ ব্রহ্মসুধা পান করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি প্রকার ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার ও একটী দৃষ্টান্ত, যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা, নিম্নে জানাইতেছি। কোন সময়ে কয়েকটী ভক্ত ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মানন্দ, ভক্তগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে, এমন একটী প্রেম ও ভক্তির ধারা তাঁহাদের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দিলেন যে, তাঁহারা সকলেই আত্মবিস্মৃত হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রি প্রায় ১১।১২টা পর্য্যন্ত সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া রহিলেন। তৎপরে তাঁহারা আচার্য্যদেবের গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিতল গৃহের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া ঐ বিষয় আলোচনা করিতে করিতে ১॥০টা বাজিল। তৎপরে ঐ বিষয় আলোচনা করিতে করিতে দ্বিতল সিঁড়িতে দাঁড়াইলেন, ৩টা বাজিল, তাঁহাদের কাহারও হুঁস নাই; কোন ক্রমে আচার্য্যদেবের বাটী পরিত্যাগ করিয়া পটলডাঙ্গায় মাধববাবুর বাজারের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে দাঁড়াইয়া ঐ বিষয় আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি শেষ হইল ও কাক ডাকিয়া উঠিল, ফরসা হইল, তথাপি হুঁস নাই; কেহ

কাহাকেও ছাড়িতে চাহেন না। কি আশ্চর্য্য নেশা! এমন নেশা আমি জীবনে কখন দেখি নাই।

আর একটী ঘটনা—কোন সময়ে আমাদের পূজনীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনার পর একটী উপদেশ দিয়াছিলেন। ঐ উপদেশটি উপাসকগণের এমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, প্রায় দুই শত উপাসক উপাসনান্তে আচার্য্যদেবের বাটীতে গমন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপদেশটির বিষদ ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এখন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সকল, আপনারা অতীতের পুণ্যাত্মা সাধু মহাত্মাদিগের পুণ্যময় প্রভাবে এই ব্রাহ্ম-সমাঁজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

কেশবচন্দ্রের চিন্তা যে কেবল ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা নহে। তাঁহার চিন্তা ও শক্তি হিন্দু যুবকদিগের মঙ্গলের জন্যও নিয়োজিত হইয়াছিল। যখন বঙ্গদেশে শিক্ষা-রূপ অগ্নি অল্লে অল্লে প্রজ্বলিত হইয়া যুবকদিগের প্রাণমনকে ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত করিতেছিল, তখন তাহারা হিন্দু সমাজের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতিতে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া, এক নব তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল। এই গভীর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য অনেক যুবক খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন দেখিয়া, চিন্তাশীল ব্রহ্মানন্দ সেই স্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং নানাস্থানে খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন; ইহা দেখিয়া চুঁচুড়ায় লালবিহারী দে ও কৃষ্ণনগরের মিসনারী ডাইসন সাহেব কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে উভয় দল কিছু দিন বক্তৃতা করিলে

বড়লাটের সভাতে "ব্রাহ্ম বিবাহ আইন" প্রচারের জন্য একখানি দরখাস্ত পাঠাইলেন এবং টাউন হলে একটী বিরাট সভার আয়োজন করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি কয়েকটী আদি সমাজের সভা একত্রিত হইয়া সেই সভাতে উক্ত বিধি প্রণয়নের প্রতিবাদ করায়, গভর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাশ না করিয়া সাধারণের জন্য ১৮৭২ সালের ৩ আইন নাম দিয়া একটী আইন পাশ করিলেন।

অতীতের সাধনপ্রিয় উপাসকগণ ব্রহ্মসুধা পান করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি প্রকার ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত, যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা, নিম্নে জানাইতেছি। কোন সময়ে কয়েকটী ভক্ত ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মানন্দ, ভক্তগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে, এমন একটী প্রেম ও ভক্তির ধারা তাঁহাদের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দিলেন যে, তাঁহারা সকলেই আত্মবিস্মৃত হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রি প্রায় ১১।১২টা পর্য্যন্ত সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া রহিলেন। তৎপরে তাঁহারা আচার্য্যদেবের গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিতল গৃহের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া ঐ বিষয় আলোচনা করিতে করিতে ১৷৹টা বাজিল। তৎপরে ঐ বিষয় আলোচনা করিতে করিতে দ্বিতল সিঁড়িতে দাঁড়াইলেন, ২টা বাজিল, তাঁহাদের কাহারও হুঁশ নাই; কোন ক্রমে আচার্য্যদেবের বাটী পরিত্যাগ করিয়া পটলডাঙ্গায় মাধববাবুর বাজারের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে দাঁড়াইয়া ঐ বিষয় আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি শেষ হইল ও কাক ডাকিয়া উঠিল, ফরসা হইল, তবুও হুঁশ নাই; কেহ

কাহাকেও ছাড়িতে চাহেন না। কি আশ্চর্য্য নেশা! এমন নেশা আমি জীবনে কখন দেখি নাই।

আর একটী ঘটনা—কোন সময়ে আমাদের পূজনীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনার পর একটী উপদেশ দিয়াছিলেন। ঐ উপদেশটি উপাসকগণের এমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, প্রায় দুই শত উপাসক উপাসনান্তে আচার্য্যদেবের বাটীতে গমন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপদেশটির বিশদ ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এখন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সকল, আপনারা অতীতের পুণ্যাত্মা সাধু মহাত্মাদিগের পুণ্যময় প্রভাবে এই ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

কেশবচন্দ্রের চিন্তা যে কেবল ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা নহে। তাঁহার চিন্তা ও শক্তি হিন্দু যুবকদিগের মঙ্গলের জন্যও নিয়োজিত হইয়াছিল। যখন বঙ্গদেশে শিক্ষা-রূপ অগ্নি অল্পে অল্পে প্রজ্বলিত হইয়া যুবকদিগের প্রাণমনকে ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত করিতেছিল, তখন তাহারা হিন্দু সমাজের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতিতে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া, এক নব তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল। এই গভীর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য অনেক যুবক খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন দেখিয়া, চিন্তাশীল ব্রহ্মানন্দ সেই স্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং নানাস্থানে খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন; ইহা দেখিয়া চুঁচুড়ায় লালবিহারী দে ও কৃষ্ণনগরের মিসনারী ডাইসন সাহেব কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে উভয় দল কিছু দিন বক্তৃতা করিলে

পর, পরিশেষে কেশবচন্দ্র জয়লাভ করিলেন। তখন হিন্দু যুবকদিগের নব আকাঙ্ক্ষা ব্রাহ্মসমাজের দিকে ধাবিত হইল এবং তাহারা দলে দলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। সেই এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ অপর দিকে খৃষ্ট সমাজ, এই উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দু-সমাজ কি প্রকার বিপর্য্যয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল, সকলে একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

অর্দ্ধ শতাব্দী অগ্রে কলিকাতা ও মফঃস্বলে মদ্যপায়ীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাওয়া আসা করা ভদ্রলোকদিগের পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার নানাস্থানে শুণ্ডিকালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে মাতালের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, এক দিকে মহাত্মা প্যারীচরণ সরকার ও প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর), অপরদিকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মদ্যপানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান্ হইলেন এবং ইহার প্রতীকারের জন্য নানাপ্রকার পুস্তিকা ছাপাইয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে কোন আশু ফলের প্রত্যাশা না দেখিয়া কেশবচন্দ্র সাধারণ বক্তৃতা দ্বারা এই পাপস্রোতের গতিকে ক্রমে ক্রমে প্রশমিত করিয়া তুলিলেন। তিনি "মদ না গরল" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সাধারণ মদ্যপায়ীর জন্য প্রকাশ করিলেন এবং যুবকদিগের জন্য "আশাবাহিনী" নামক একটী নূতন সভা স্থাপন করিলেন।

এইরূপে কেশবচন্দ্র নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজকে আশানুরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৮৭০ সালে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য

ভারতী ভবন

ইংলণ্ডে গমন করিলেন। সে খানে তিনি কয়েক মাস ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মবলে বলীয়ান হইয়া নবোদ্যমে ও নবোৎসাহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি "ভারত সংস্কার সভা" নাম দিয়া একটী সভা সংস্থাপন করিলেন। এই সভাকে তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিভাগ, দাতব্য বিভাগ, সুলভ সাহিত্য বিভাগ প্রভৃতি নানাপ্রকার শাখায় বিভক্ত করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

তিনি প্রথমে "ভারতাশ্রম" নাম দিয়া একটী আশ্রম স্থাপন করিলেন। এখানে পুরুষেরা সস্ত্রীক একত্রে ধর্ম্মসাধন দ্বারা আত্মোন্নতি করিবেন বলিয়া তদুপযোগী নিয়মাবলী প্রণয়ন করিলেন। এবং বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য একটী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই স্কুলে তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় পূতচরিত্র গৌরগোবিন্দ বাবু, বিজয় বাবু, শিবনাথ বাবু ও অঘোর বাবুকে শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই বৎসর শিবনাথ বাবু এম, এ, পাশ করিয়া শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আশ্রমে প্রতিদিন প্রাতে ৮টার সময় ব্রহ্মানন্দ সকল স্ত্রীপুরুষদিগকে লইয়া উপাসনা করিতেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই আশ্রমে এক নব শক্তি ও ব্যাকুলতা জাগ্রত হইয়া উঠিল।

তৎপরে তিনি সাধারণ যুবকদিগের চরিত্র গঠনের জন্য "ব্রাহ্ম নিকেতন" নাম দিয়া একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি নিজে ইহার নিয়মাদি গঠন করিয়া দুই একটী প্রচারকের উপর ইহার নিয়মিত উপাসনার ভারার্পণ করিলেন। প্রতিদিন প্রাতে এখানে নিকেতনবাসী সকলকে লইয়া তাঁহারা উপাসনা করিতেন। সময়ে সময়ে ব্রহ্মানন্দ নিজে আসিয়াও উপাসনা করিতেন। এখানে থাকিয়া সকল সম্প্রদায়ের ব্রহ্মবিশ্বাসী যুবক সকল, কেহ স্কুলে, কেহ বা কলেজে, পাঠাভ্যাস করিতেন। ভুবনমোহন সিংহ নামক একটী আত্মত্যাগী সচ্চরিত্র যুবকের উপর নিকেতনের কার্য্যাধ্যক্ষের ভার অর্পিত হইল। ভুবন বাবু অক্লান্ত ভাবে এই ব্রাহ্মনিকেতনবাসী যুবকদিগের আহারাদির ব্যবস্থা এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। আমিও নিকেতনে অনেক দিন অবস্থিতি পূর্ব্বক জীবনের নানাপ্রকার উন্নতি সাধন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক অমৃতলাল বসু মহাশয় নিকেতনবাসী যুবকদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সহায় হইয়া তাহাদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও উপাসনা ও উপদেশ দ্বারা নিকেতনবাসী যুবকদিগের চরিত্রোন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। আজ সেই দেবতাগণ স্বর্গে; সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা

করিতেছি। এখনও নিকেতনবাসী অনেক যুবক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীবিত আছেন।

ব্রহ্মানন্দ সেই সময়ে সাধারণের ভিতর জ্ঞান প্রচারের জন্য "সুলভ-সমাচার" নাম দিয়া একখানি এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এক পয়সা মূল্যের সংবাদ পত্র ভারতবর্ষে কেহ প্রকাশ করেন নাই। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক। শ্রদ্ধেয় উমানাথ বাবু ও ত্রৈলোক্য বাবু ইহার সম্পাদনের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক কয়েক বৎসর ইহা সুন্দর রূপে পরিচালনা করিয়া দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ বাবুও লেখা দ্বারা ইঁহাদের অনেক সাহায্য করিতেন। ইহা প্রকাশ হইবার অনেক পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক একখানি ধর্ম্মবিষয়ক পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তৎপরে ব্রহ্মানন্দ সাধারণের উপকারের জন্য, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, একটী দাতব্য বিভাগ খুলিলেন। ইহাতে কোন প্রকার মূলধন ছিল না, দাতাদিগের সাহায্য এবং ভগবানের কৃপা একমাত্র মূলধন করিয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ঠিক সেই সময়ে কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত বেহালা গ্রামে এক প্রকার জ্বর রোগের মহামারী উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কেশবচন্দ্র যখন এই হৃদয়বিদারক সংবাদ অবগত হইলেন, তখন তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া ইহার প্রতীকারের জন্য স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া ঔষধাদি ক্রয় করিলেন। পরে বিজয়কৃষ্ণ, কান্তিবাবু ও ডাক্তার তুকড়ি ঘোষকে সেবা ও চিকিৎসার জন্য সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। (সকলে বোধ হয় অবগত আছেন যে, বিজয় বাবু কলিকাতা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন বাঙ্গালা ক্লাশে ৩ বৎসর

কাল চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন)। ইঁহারা কয়েক মাস পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে ও আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবা শুশ্রূষা এবং ঔষধ ও পথ্য দ্বারা গ্রামবাসী দুঃখী ও দরিদ্রের সেবায় নিজ নিজ জীবনকে নিয়োগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে এক অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই কার্য্যে শ্রদ্ধেয় দাতা দুর্গামোহন দাস মহাশয় অকাতরে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে গোস্বামী মহাশয়ের শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া হৃদ্‌রোগ প্রকাশ পাইল। তিনি বক্ষের যন্ত্রণায় এক এক সময় ছট্‌ফট্‌ করিতেন। ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগীর মহাশয় তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইয়া নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগেও যখন আশু-ফল দেখিতে পাইলেন না, তখন মরফিয়া ঔষধ ভিতরে প্রবেশ ও সেবন করাইয়া পীড়ার কিছু উপশম করিলেন। গোস্বামী মহাশয় এই পীড়া হইতে কখনও একেবারে মুক্ত হন নাই। এই পীড়া আমৃত্যু তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিল। অতীত কালের প্রচারকগণ কেবলমাত্র ধর্ম্ম প্রচার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না; তাঁহারা নরনারীর সেবার জন্যও জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

অতীতের প্রচারক পরিবার।

অতীতের প্রচারক পরিবারদের কথা পূর্ব্বে লিখি নাই; কেন না, সেই সময়ে সকল প্রচারক পরিবার হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দেন নাই। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দুই একটী প্রচারক-পরিবারকে ব্রাহ্মসমাজে আনিতে ব্রহ্মানন্দকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। বিশ্বাসী প্রচারকগণ যেমন নিজেদের ভার ঈশ্বরচরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে সাধন ভজন ও প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, তেমনি স্ত্রী পুত্র পরিবারগণের ভারও ঈশ্বরচরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রচার-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহাদের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রচারক-পরিবারেরা কি প্রকার কষ্ট ও দরিদ্রতার ভিতর তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া অবস্থিতি করিতেন, তাহা এখন স্মরণ করিলে বাস্তবিকই চক্ষের জল আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি স্বচক্ষে তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়াছি। কয়েকটী প্রচারক পরিবার আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। আমি সময়ে সময়ে তাঁহাদের দর্শনেচ্ছায় গমন করিতাম। তাঁহারা আমাকে বলিতেন, "তুমি যদি কান্তিবাবুকে আমাদের জন্য কিছু বল, তাহা হইলে আমাদের কষ্টের কিছু লাঘব হয়। তিনি আমাদিগকে প্রতিদিন যাহা দেন, তাহাতে আমাদের ভাল করিয়া ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয় না। আমাদের কষ্টের অবধি নাই। আর ওঁকে (অর্থাৎ স্বামীকে) বলিলে তিনি কান্তিবাবুর দোহাই দিয়া আমাদের কথা কানে তোলেন না।" বাস্তবিক আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, প্রচার-কার্য্যালয়ে অর্থাভাবের

জন্য প্রচারকগণ অনাহারে দিনপাত করিতেন। আমি শ্রদ্ধেয় প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি কোন সময়ে কৃষ্ণনগর হইতে বিজয়বাবুর কলিকাতাস্থ রাধানাথ মল্লিকের লেনের বাসায় আসিয়া কেবলমাত্র ডুমুটী ফুল ভাজা ও তেঁতুল গোলা জল দিয়া অন্নাহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। স্বার্থত্যাগ, নির্ভরশীল প্রচারকগণ, একদিকে ভগবানে আত্মসমর্পণ, অপর দিকে দুঃখ ও দৈন্যকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত পাঠ ও আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল সম্প্রদায়ের সাধকদিগের মধ্যেই ভগবানে আত্মসমর্পণ এবং দুঃখ দৈন্যকে সাদরে আলিঙ্গন ভিন্ন কোন সম্প্রদায় উন্নতির সোপানে উঠিতে পারেন নাই। যেখানে স্বার্থপরতা, বিলাসিতা বা আত্মসুখেচ্ছা প্রবল, সেইখানেই ধর্ম্মহীনতা ও পতন।

প্রচারকগণ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রচারকগণ এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকব্রত গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েকটী মহাত্মা মহর্ষি দেবের সহবাস পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রচারব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎপরে যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব একটু একটু করিয়া বঙ্গদেশে বিস্তারিত হইল, তখনই কয়েকটী আত্মত্যাগী ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি নিজ নিজ স্বার্থ ও অর্থোপার্জ্জনের পথ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচারব্রত অবলম্বন করিলেন। ইহাদের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী ভিন্ন কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ছিলেন না। ঈশ্বর ইঁহাদিগকে অল্লাধিক শক্তি দিয়া ব্রাহ্মসমাজে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা সেই শক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মকৃপা সম্বল করিয়া, নিজ নিজ সাধন ভজন দ্বারা কেহ বা সাহিত্য ক্ষেত্রে, কেহ বা সঙ্গীত বিদ্যায়, কেহ বা ধর্ম্ম-বিজ্ঞান রাজ্যে—হিন্দু, মুসলমান্, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায়,—কেহ বা ভক্তি ও প্রেম সাধনায়, কেহ বা যোগেশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া, এই ব্রাহ্মসমাজকে একটী আদর্শ পুণ্যভূমি করিয়া গিয়াছেন।

ভক্তবৎসল ভগবান্ যখনই কোন প্রেমিক ও ভক্ত হৃদয়ে আত্মতত্ত্বের বিকাশ করিয়া ভক্তকে চরিতার্থ করেন, তখনই তিনি ভক্তের সেই হৃদয়োদ্যানে প্রস্ফুটিত তত্ত্ব-কুসুমের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ সাধারণ মানবের হিতার্থে বিতরণ করিবার জন্য তাঁহার প্রচার-শক্তি ভক্তহৃদয়ে প্রদান করিয়া থাকেন। আমাদের

অতীত কালের ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ এই ব্রহ্মশক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ ও প্রতাপচন্দ্র কলিকাতায় বিশেষ কার্য্যে আবদ্ধ থাকা নিবন্ধন সর্ব্বদা মফঃস্বলে প্রচারে যাইতে পারিতেন না। তবে যেখানে বাৎসরিক উৎসবাদি হইত, সেখানে যাইয়া উৎসব সম্পন্ন করিয়া আসিতেন। কলিকাতা সমাজে উপাসনা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলে যাইয়া প্রচার করিতেন। কিন্তু ভক্ত-বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ অভাবনীয় উদ্যমে প্রচারক্ষেত্রে বহির্গত হইয়া বঙ্গদেশের অসংখ্য নগরে, গ্রামে ও পল্লীতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সাধারণ নরনারীকে ভক্তি ও প্রেমের স্রোতে ভাসাইয়া সকলকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের প্রচার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শ্রদ্ধেয় বঙ্কবিহারী কর ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের জীবন চরিতে তাঁহার প্রচারবিবরণ সবিশেষ লিখিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সুতরাং আমার পক্ষে বিজয়কৃষ্ণের প্রচারবিবরণ বিশেষ করিয়া লেখা নিষ্প্রয়োজন। বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের যে শ্রেষ্ঠ উপকরণ প্রেম ও ভক্তি, তাহা তাঁহার অস্থিমজ্জা এবং ধমনীর রক্তপ্রবাহের সঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া প্রচারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া, বঙ্গদেশে স্বর্গ হইতে ব্রহ্মনামের মন্দাকিনী, প্রেম ও ভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া, অবতীর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার প্রচার সম্বন্ধে একটী প্রকৃত ঘটনা শুনিয়াছি। তাহা এই যে, তিনি কোন সময়ে আসামাঞ্চলে প্রচারের জন্য বহির্গত হইয়া রাস্তায় কোন স্থানে খুৎপিপাসায় কাতর হইয়া একটী পুষ্করিণী হইতে একটু কর্দ্দম তুলিয়া উদরপূর্ণ এবং

পরে জল পান করিয়া পথ শ্রান্তি নিবারণ করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ আর একটী প্রচার কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—অতীতের ব্রাহ্মসমাজের অনেক সদাশয় মহাত্মা অবগত ছিলেন যে, যশোহর জেলার অন্তর্গত বাঘআঁচড়া নামক একটী পল্লীগ্রামে হালদার ও মল্লিক উপাধিধারী কয়েক ঘর পিরালী ব্রাহ্মণকে সাধারণের ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য হইয়া বাস করিতে দেখিয়া গোস্বামী মহাশয়, নিজের স্বাভাবিক প্রেম ও ভক্তিপ্রবণতাগুণে আকৃষ্ট হইয়া, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার জন্য সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহাদিগকে ধর্ম্মের মধুরতা পানে সক্ষম করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের ভিতর শুধু ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই; তাহাদের পুত্র-কন্যাদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের প্রেম ও ভক্তিময় চরিত্র প্রভাবে বাঘআঁচড়াবাসী লোকসকল ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পতিত ও অস্পৃশ্য অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ প্রথমেই আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়া নেবুতলা ৺কালীনাথ দের বাটীতে, রামকৃষ্ণপুরে, সাঁতরাগাছী, কোন্নগর, শ্রীরামপুর ও শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা, বক্তৃতা ও আলোচনা দ্বারা চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মানন্দের ধৈর্য্য ও ক্ষমা।

আমি এতদিন তাঁহার সহবাসে কাটাইয়াছি, কিন্তু একদিনের জন্যও তাঁহাকে অধৈর্য্য, উত্তেজিত বা নির্দ্দয় হইতে দেখি নাই। বরং ধৈর্য্য ও ক্ষমা সম্বন্ধে দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার বোধ হয় ১৮৭২ সালে ব্রহ্মানন্দ কয়েকটী প্রচারক সঙ্গে লইয়া রেলের একটী তৃতীয় শ্রেণীর কাম্‌রা ভাড়া করিয়া, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাহির হইয়া পথে বাঁকিপুর ও এলাহাবাদ হইয়া একেবারে কানপুরে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি এবং আমার দুইটী পরম বন্ধু, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় (ইনি এখনও জীবিত আছেন) ও শিবহরি পাঠক তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ক্ষেত্রবাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেখানে কার্য্যোপলক্ষে সপরিবারে বাস করিতেন। ব্রহ্মানন্দ প্রতিদিন প্রাতঃকালে সকলকে লইয়া উপাসনা করিতেন। একদিন উপাসনান্তে ক্ষেত্রনাথের পিতা হঠাৎ ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে আসিয়া অকথা ও অশ্লীল ভাষায় তাঁহাকে গালি দিয়া দুর্ব্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা সকলে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলাম। ক্ষেত্রনাথের পিতার মুখ হইতে এই সকল কথা বাহির হইয়াছিল, "তুই বেটা কলিকাতায় সকল ছেলেদের মাথা খাইয়া পশ্চিমে ছেলেদের মাথা খাইবার জন্য এখানে আসিয়াছিস্, এখনই আমার বাটী হইতে বাহির হইয়া যা"।

ক্ষেত্রনাথ কোন প্রকারে তাঁহার পিতাকে স্থানান্তরে লইয়া

গেলেন। ব্রহ্মানন্দ এত গালি খাইয়া চুপ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। এই সময়ে কি আশ্চর্য্য ক্ষমা ও ধৈর্য্য ব্রহ্মানন্দের ভিতর দেখিয়াছিলাম! তৎপরে শুনিলাম যে, ক্ষেত্রনাথের পিতা ব্রাহ্মদিগকে মারিবার জন্য মন্ত্রণা করিয়া গুণ্ডা ঠিক করিয়াছেন। ইহাতে কেশবচন্দ্র ভ্রূক্ষেপ ও করিলেন না। ব্রহ্ম যাঁহার সহায়, মানবের ভ্রূকুটীতে তিনি বিচলিত হন না। ব্রহ্মানন্দ তিন দিন কানপুরে থাকিয়া লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মানন্দের ক্ষমা ও ধৈর্য্য সম্বন্ধে আর একটা ঘটনা ঘটিয়া ছিল; পরে ভক্ত উমেশচন্দ্রের জীবনীতে তাহা জানিতে পারিবেন।

ব্রহ্মানন্দের প্রভাব ও সাধনা।

খৃষ্টীয়, বৌদ্ধ, মুসলমান্, বৈষ্ণব, নানক ও কবীর প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে এক একটী প্রতিভাশালী নেতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, উক্ত সম্প্রদায়সকল উন্নতির সোপানে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল। আমাদের অতীতের ব্রাহ্মসমাজেও ব্রহ্মানন্দ কি এক অসাধারণ ব্রহ্মশক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে এত উচ্চ স্থানে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল। আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্মানন্দ একদিকে যেমন পুষ্পের ন্যায় কোমল ছিলেন অপর দিকে তেমনি বজ্রের ন্যায় কঠিন ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের প্রভাব ও ধর্ম্ম-জ্যোতি যখন ভারতের সর্ব্বস্থানে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, তখন আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া দেখিতাম যে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যেমন কীট পতঙ্গাদি আসিয়া সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে আত্মাহুতি দিয়া নিজকে সার্থক জ্ঞান করে, ঠিক সেই প্রকার, বঙ্গদেশের কেন, ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যখন ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট আসিতেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকার প্রভাবে ব্রহ্মানন্দের ব্রহ্ম-প্রজ্বলিত হুতাশনে আত্মাহুতি প্রদান না করিয়া কেহ প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন না। কত শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী ও নির্ধন, পাপী ও পুণ্যবান তাঁহার মধুময় চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব।

ব্রহ্মানন্দ এই কোলাহলময় মহানগরীতে থাকিয়া সাধনভজন করা সুবিধাজনক মনে না করিয়া নির্জ্জন সাধন করিবার জন্য

বেলঘরিয়া জয়গোপাল ও বৈকুণ্ঠনাথ সেনের উদ্যানে গমন করিয়াছিলেন। তিনি এখানে আসিয়া সাধারণ উপাসকগণের জন্য প্রতি রবিবার প্রাতে উপাসনার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অনেক যুবক ও বৃদ্ধ সেই পুষ্পলতা-শোভিত উদ্যানে গমন করিয়া সাধারণ উপাসনায় যোগ দান করিতেন এবং এক একটী বৃক্ষতলে বসিয়া নির্জ্জন সাধন করিতেন। এই বেলঘরিয়া উদ্যানে দক্ষিণেশ্বর রাণী রাসমণির ঠাকুরবাটী-প্রবাসী রামকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। রামকৃষ্ণের বৃত্তান্ত পরে কিছু লিখিয়া সকলকে জানাইতেছি।

ভক্তি ও প্রেমের আদান প্রদান।

অতীতের ব্রাহ্মসমাজে বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উপাসকগণ, প্রেম ও ভক্তির আদানপ্রদানে, কি এক আশ্চর্য্য বন্ধনে পরস্পরকে আবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে তাঁহাদের পুণ্যময় চরিত্রের প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত আমি সকলকে জানাইতেছি।

যখন ১১ই মাঘের পূর্ব্বাভাস দেখা যাইত, তখন যুবক ব্রাহ্মদিগের প্রাণে একটা আগ্রহ, উৎসাহ ও প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইত। মফঃস্বল হইতে যে সকল উপাসক ১১ই মাঘের উৎসবে আসিতেন, যুবকগণ তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া নিজের জীবনকে সার্থক করিবার ইচ্ছায় তাঁহাদিগকে নিজের নিজের বাসায় আনিয়া রাখিতেন। আবার অনেকে প্রচার কার্য্যালয়ে আসিয়া থাকিতেন। কিন্তু যুবকগণ ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া, তাঁহাদিগকেও নিজের বাসায় আনিবার জন্য প্রচার কার্য্যালয়ে যাইতেন। ইহাতে শ্রদ্ধেয় কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলিতেন, "তোমরা লোক ভাঙ্গাও কেন হে? উঁহারা এখানে বেশ আছেন।" এই একপ্রকার প্রেমভক্তির আদান প্রদান। অপর আর দুই একটী ঘটনা এই—আমি একবার কোন কার্য্যোপলক্ষে, বোধ হয় ১৮৭১ সালে, ঢাকায় গিয়া আমার একটী বন্ধুর বাসায় অবস্থিতি করিতে করিতে চিন্তা করিতে ছিলাম যে, আমার বন্ধুটীকে সঙ্গে লইয়া ঢাকাস্থ পূজনীয় ব্রাহ্মদিগকে দর্শন করিব। ইতিমধ্যে আমাদের পূজনীয় দেবোপম-প্রকৃতি কালীনারায়ণ

গুপ্ত মহাশয়, আমি ঢাকায় আসিয়াছি শুনিয়া, প্রাতঃকালে আমাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আমার সেই বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমাকে আজ আমার ওখানে আহার করিতে হইবে"। আমি তাঁহার অনুগমন করিয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়া দেখি যে, একটী গৃহে উপাসনার স্থান হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয় আমাকে লইয়া উপাসনায় বসিলেন। তাঁহার দুই একটী কন্যা সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। কি সুন্দর মনোহর উপাসনা! তাহার সঙ্গে কন্যা কয়েকটীর সুললিত সঙ্গীত! এই উভয় সম্মিলিত হইয়া এমন একটা প্রেম ও ভক্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল যে, আর সে মধুময় সম্মিলন পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। তৎপরে পরিপাটীরূপে প্রীতি-ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি সম্ভোগ করিলাম। সেই দেবতার নিকট বসিয়া কত উপদেশ শুনিলাম! অতীতকালে এমন সুশৃঙ্খলা-বদ্ধ ব্রাহ্ম পরিবার তখন দেখি নাই। তৎপরে ঢাকাস্থ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতি ধর্ম্মবিশ্বাসী বন্ধুদিগকে দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

শ্রদ্ধাস্পদ চাঁদমোহন মৈত্রেয় মহাশয় যখন কুমারখালী হইতে কলিকাতায় ১১ই মাঘের উৎসবে আসিতেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক মধুময় চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিতাম। তিনি আমাদিগকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধের পদধূলি মস্তকে লইলে জীবনকে কৃতার্থ মনে করিতাম। ব্রাহ্মসমাজে এই সকল পুণ্য-প্রকৃতি সাধুপুরুষের পুণ্যস্মৃতি যাহা একবার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাবধি বিলুপ্ত হয় নাই।

মানবচরিত্র আলোচনা করিলে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, মানব ধর্ম্মহীনতানিবন্ধনই নিজ নিজ পদমর্য্যাদা, ধনৈশ্বর্য্য ও বিদ্যার অহঙ্কার করিয়া থাকে। কিন্তু মানব যখন সাধনা দ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে বশীভূত করিয়া সত্ত্বগুণের অধিকারী হইয়া, প্রকৃত ধর্ম্মের সার জিনিষটাকে অনুভব করিতে শিক্ষা করেন, তখন বিনয়ে অবনত হইয়া নিজকে অতি সামান্য ক্ষুদ্র বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা চৈতন্যদেব যৌবনের প্রারম্ভে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে বক্ষঃ স্ফীত করিয়া, বড় বড় পণ্ডিতদিগকে তর্কযুক্তি দ্বারা পরাস্ত করিয়া বেড়াইতেন। সেই চৈতন্য দেবের প্রাণে যখন কি এক অজ্ঞাত স্পর্শমণি আসিয়া লাগিল, তখন তিনি সমস্ত বিদ্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া, "তৃণাদপি সুনীচ" হইয়া, পাপীতাপীকে হরিনাম বিতরণের জন্য নিজেকে হরির চরণে বিসর্জ্জন করিলেন।

অতীতকালে আমাদের ব্রাহ্মসমাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী শিক্ষিত যুবকগণ সাধনা দ্বারা এমন এক স্পর্শমণি হৃদয়ে লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই, পদমর্য্যাদা ও বিদ্যার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, প্রেমভক্তির আদান প্রদানে সকলকে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এমন কি বঙ্গের সুকৃতী সন্তান শ্রদ্ধাস্পদ আনন্দমোহন বসু, বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান ধর্ম্মে ও পবিত্রতায় উচ্চ স্থানের অধিকারী হইয়াও নিজকে "তৃণাদপি সুনীচ" জ্ঞান করিতেন। এই সকল সুকৃতী পুণ্যবান্ সন্তানদিগের পুণ্যপ্রভাবে অতীতের ব্রাহ্মসমাজ পরকে কি প্রকার আপন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় পুণ্য ও প্রীতিতে পূর্ণ হইয়া উঠে।

অতীতের ব্রাহ্ম চরিত্র।

অতীতের ব্রাহ্ম চরিত্র লিখিতে হইলে, ব্রাহ্মসমাজে যত চরিত্র-বান্ সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের কথাই লিখিতে হয়; কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। কেবলমাত্র সামান্য দুই একটী ঘটনা লিখিতেছি।

অনেক বৎসর আগেকার কথা। আমি যখন ব্রাহ্মসমাজে আসি নাই, বারুইপুর ইংরাজি স্কুলে নিম্নশ্রেণীতে পাঠাভ্যাস করিতাম, তখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং কালীনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। একদা কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ একটু কাগজ কলমের জন্য কাছারিতে গিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ, এই কাগজ কলম আমার নয়, ইহা গভর্ণমেণ্টের জিনিষ, আমি তোমাকে ইহা কেমন করিয়া দিতে পারি? তোমার বিশেষ দরকার, আমি একটু লিখিয়া দিতেছি, তুমি অমুককে দেখাইলে কাগজ কলম পাইবে।" আমি সেখানে গিয়া কাগজ কলম লইয়া নিজের কার্য্য সমাধা করিয়া, ক্রোধান্বিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালীনাথবাবুর চরিত্রের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া বিস্মিত হইলাম।

কালীনাথবাবু সত্য ও ন্যায় বলিয়া যাহা বুঝিতেন, তাহা দৃঢ়তার সহিত পালন করিতেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁহার পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি বেশ ছিল। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা

গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহারা বাটীতে গোপাল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি, ঐ গোপাল এমন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, ঐ গোপালের মস্তক হইতে গুহ্য দ্বার পর্য্যন্ত একটী ছিদ্র ছিল। প্রতিদিন ঐ গোপালের পুষ্পার্চ্চনা হইত। পরে ব্রাহ্মণ যখন সন্ধ্যার সময় পূজা শেষ করিতেন, তখন তিনি একটী ছিপি নিম্নে বন্ধ করিয়া উপর হইতে অম্লরসযুক্ত দুগ্ধ ঐ গোপালের মস্তকোপরি ঢালিয়া দিতেন এবং নিম্নে একটী পাত্র রাখিতেন। পরদিন ব্রাহ্মণ আসিয়া উহা বাহির করিয়া দিতেন। বাটীর সকলে গোপালের দধি-বিষ্ঠা চরণামৃত জ্ঞানে একটু একটু করিয়া সেবন পূর্ব্বক জলগ্রহণ করিতেন। এমন বৈষ্ণবগৃহে কালীনাথবাবু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন ব্রহ্মকৃপা তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইল, তখন তিনি পৌত্তলিক পূজা পাপ মনে করিয়া, সেই গৃহ-দেবতাকে সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাতে দেশের লোক তাঁহার উপর নানাপ্রকার দুর্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ত্তব্যজ্ঞানে যাহা বুঝিয়াছিলেন, মনুষ্যের ভ্রূকুটীতে তাহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সেই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের সাধের আরাধ্য গোপাল অদ্যাবধি তাঁহার পুত্রদ্বয় সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কালীনাথ দত্ত মহাশয় গভীর সাধক ছিলেন। তিনি পার্থিব ধনৈশ্বর্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মকে বড় মনে করিতেন। তিনি যখন গভর্ণমেণ্টের চাকরী পরিত্যাগ করিবার কল্পনা করিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয়েরা আসিয়া চাকরী পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু কাহারও কথা না শুনিয়া, তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

একটী নির্লোভ ব্রাহ্ম চরিত্র।

প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা—একদিন সাধু উমেশচন্দ্র আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "গিরিডির প্রায় তিন চারি মাইল পশ্চিমে, পচম্বা নামক স্থানে, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু নামে একটী সাধু চরিত্রের ব্রাহ্ম বাস করেন, তাঁহার নিকট একবার যাইব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে"।

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নূতন স্থান দেখিবার জন্য উৎসুক হইলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা উভয়ে মধুপুরে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া গিরিডি যাইয়া পৌছিলাম। তৎপরে পুস্ পুস্ নামক গাড়ীতে উঠিয়া পচম্বায় শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি বাবুর বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখিলাম, একটী শান্ত-প্রকৃতি মধুরভাষী ও বিনয়ী ভদ্রলোক—"ইনিই তিনকড়ি বাবু", এই বলিয়া উমেশবাবু আমার নিকট তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। তিনি সেই সময়ে পচম্বার কোর্ট-অব-ওয়ার্ডে চাকরী করিতেন। আমি দুই এক দিন তাঁহার আতিথ্য সৎকারে ও মধুময় ব্যবহারে এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, তাঁহার উপর শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। তাঁহার যৌবনে তাঁহার সহধর্ম্মিণী একটী পুত্র সন্তান রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি বাবু পুনরায় দার পরিগ্রহ না করিয়া, এক দিকে সংসার প্রতিপালনের জন্য অর্থোপার্জ্জন, অপর দিকে ব্রাহ্ম-সমাজের সেবায় নিজ জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি হাজারীবাগ জেলায় নানা স্থানে চাকরী

করিয়া নিজের চরিত্রপ্রভাবে সকল স্থানে পূজিত হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের নিবন্ধন ধানোয়ারের মহারাণী তাঁহাকে আজীবন পেন্সেন পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি গিরিডির সন্নিকট গাদি-শ্রীরামপুরের রাজার ষ্টেটে ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া, কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া, কয়েক লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া দিয়াছিলেন। আমি শুনিয়াছি, একদিন রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া এক তাল পাকা সোণা রাখিতে দিয়াছিলেন। রাজা কোন প্রকার রসিদ লইলেন না দেখিয়া, তিনি রাজাকে জানাইলেন, "আপনি এত মূল্যবান্ সোণা আমার নিকট রাখিতে আজ্ঞা দিলেন, ইহার একটী রসিদ আপনাকে দিতেছি, গ্রহণ করুন।" তাহাতে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার উপর আমার যে বিশ্বাস আছে তাহাই আমার রসিদ, আমি রসিদ চাই না"। এইরূপে তিনি সেখানে চাকরী করিতে করিতে, কোন ঘটনা বশতঃ রাজার সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায়, রাজার সমস্ত ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের অধীনে আসিল। শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি বাবু ষ্টেটের সমস্ত হিসাবপত্র গভর্ণমেণ্টেকে বুঝাইয়া দিয়া, পরিশেষে রাজা তাঁহার নিকট যে সোণার তাল রাখিয়াছিলেন,—যাহার হিসাব কোন খাতায় ছিল না,—তাহা পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিয়া, আনন্দ-চিত্তে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। এখন পাঠক পাঠিকা এই চরিত্রবান্ মহাত্মার জীবনে ব্রহ্মশক্তির প্রভাব চিন্তা করিয়া দেখুন। ইঁহার চরিত্রপ্রভাবে গিরিডি একটী পুণ্যক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের লোক ইঁহাকে সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকেন। নরসেবা ও আতিথ্যসৎকার ইঁহার চরিত্রের একটী স্বাভাবিক গুণ। যে গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে

মৃত্তিকানির্ম্মিত খোলার ঘর ছিল, এই অশীতিপর জরাগ্রস্ত সাধু-পুরুষের যত্নে তথায় এক সুন্দর মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার অতীতের পুণ্যস্মৃতি যতই স্মরণ হইতেছে, ততই আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি তাঁহার পানে ধাবিত হইতেছে।

অতীতের ব্রাহ্মসমাজ কি কি কার্য্য করিয়াছে।

যাহারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই অতীতের ব্রাহ্মসমাজের কীর্ত্তিকলাপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রামমোহন, মহর্ষিদেব, রাজনারায়ণ, ব্রহ্মানন্দ, প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ, শিবনাথ, নগেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র প্রভৃতি কলিকাতা ও মফঃস্বলের প্রচারক ও অপ্রচারক মহাত্মা সাধুপুরুষেরা শরীরের রক্তবিন্দু দ্বারা এই ব্রাহ্মসমাজে যে অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না। দিন মাস বৎসর ও যুগ যতই অতিক্রান্ত হইবে, অতীতের ব্রাহ্মসমাজের অক্ষয় কীর্ত্তি ততই বিস্তারিত হইয়া মানবসমাজকে মুগ্ধ করিবে।

অনেক বৎসরের কথা—ঘটনাসূত্রে একদিন আমি সদাশয় দেশহিতৈষী কাশিম বাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সহিত, তাঁহার কলিকাতাস্থ প্রাসাদের উদ্যানে, ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে বেড়াইয়া, যখন তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থিত কৃত্রিম পাহাড়ে আসিয়া, দুইজনে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, তখন তাঁহার ষ্টেটের একটী প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদের উভয়ের কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের উপর গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি নিস্তব্ধ ভাবে শ্রবণ করিতেছি, এমন সময়ে মহারাজা সেই কর্ম্মচারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, (পাঠক পাঠিকা, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, তাঁহার

ব্রাহ্মসমাজের উপর শ্রদ্ধা-ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাল করিয়া শ্রবণ করুন) "আপনি ব্রাহ্মসমাজের উপর অযথা গালি দিতেছেন কেন? আপনি কখন ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত পড়িয়াছেন? আপনি জানেন না যে, ব্রাহ্মসমাজ দেশের কত উপকার করিয়াছে। এই শুনুন—তবে গালি দিবেন। আপনি হিন্দুসমাজ হইতে আমার পুত্রবধুর শিক্ষার জন্য একটী শিক্ষিতা স্ত্রীলোক আনিয়া দিতে পারিবেন?" তিনি বলিলেন, না। "যখন আমি হিন্দুসমাজে শিক্ষিতা স্ত্রীলোক পাইব না, তখন আমাকে খৃষ্টান বা ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিতা স্ত্রীলোক দ্বারা আমার পুত্রবধূকে শিক্ষা দিতেই হইবে। আমি খৃষ্টান অপেক্ষা ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের উপর বিশেষ আস্থা রাখি। দেখুন, ব্রাহ্মসমাজ আজ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে! দেখুন, আজ বাঙ্গালা সাহিত্যের যে এত উন্নতি দেখিতেছেন, ইহার মূলে ব্রাহ্মসমাজ। যে সঙ্গীতবিদ্যা আমাদের দেশে অতি ঘৃণিত ও জঘণ্য অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সঙ্গীত বিদ্যাকে ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের বসন পরাইয়া আজ কি সৌন্দর্য্যে ভূষিতা করিয়া বঙ্গ-মাতার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে! আমাদের দেশের আর্য্য ঋষিগণের রচিত উপনিষদ্ প্রভৃতি মহামূল্য ধর্ম্মগ্রন্থসকল একেবারে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজ তাহা পুনরুদ্ধার করিয়াছে। এই প্রকারে ব্রাহ্মসমাজ দেশের কল্যাণের জন্য কত মহৎ কার্য্য করিয়াছে, তাহা আর কত আপনাকে বলিব! আপনি অযথা গালি দিবেন না"।

ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের আরও অনেক কীর্ত্তি আছে; তাহা একে একে আমার যাহা স্মরণ হইতেছে, তাহা লিখিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে নিম্নে জানাইতেছি।

• বঙ্গমাতা তাঁহার যে অসহায়া, পদদলিতা ক্রীতদাসী বিধবার অশ্রুজল আবহমান কাল মুছিয়া আসিতে ছিলেন, দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগর যে বিধবার অশ্রুসিক্ত হৃদয়ের কষ্ট ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া, আজীবন নানা শাস্ত্র মন্থন ও আলোচনা করিয়া অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বিধবা-বিবাহের যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিয়াও, উহা এই বঙ্গদেশে প্রচলন করিয়া সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই, ব্রাহ্মসমাজ সেই অসহায়া দুঃখিনী বিধবাদিগের কি অশ্রুজল মুছাইয়া দেন নাই?

এক সময়ে এই বঙ্গদেশে সুরা-রাক্ষসী বিকটাকার মূর্ত্তিতে মুখব্যাদন করিয়া ধনী, নির্ধন, বিদ্বান ও মূর্খকে গ্রাস করিতে বসিয়াছিল, সেই সময়ে কে, এই সুরা-রাক্ষসীর মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, বঙ্গমাতার হৃদয় হইতে মহা ভীতির সঞ্চার নিবারণ করিয়াছিল? সে কি ব্রাহ্মসমাজ করে নাই?

হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূজ্য আর্য্য ঋষিগণ ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্ম-ধ্যান ও ব্রহ্মানন্দরস পান করিয়া, এই ভারতে বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, এক পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার পরিবর্ত্তে ভারত-বাসী অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন হইয়া, তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজার্চ্চনা করিতেছে দেখিয়া, ব্রাহ্মসমাজ কি, নিরাকার সচ্চিদানন্দ এক ব্রহ্মের পূজার্চ্চনা এই ভারতে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এক অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন নাই?

ব্রাহ্মসমাজের পূজ্যপাদ আচার্য্যগণ ব্রহ্মসাধন বলে বলীয়ান হইয়া যখন এই বঙ্গদেশের নগরে, গ্রামে, পল্লীতে ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়া, ব্রাহ্মসমাজসকল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজের

প্রভাব হিন্দু-সমাজের মূলে কঠিন আঘাত করিয়া, ইহাকে এমন আলোড়িত করিয়াছিল যে, হিন্দু-সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিত যুবকসকল দলে দলে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। সেই আলোড়িত হিন্দু-সমাজের অভিভাবকগণ ও নেতৃবর্গ নবাগত ব্রাহ্ম যুবকদিগের উপর যে প্রকার কঠোর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সেই হিন্দু-সমাজ আজ কালস্রোতে ভাসিয়া কি প্রকার সাম্যভাব ধারণ করিয়াছে, তাহা একবার সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন। ইহার মূলে কি ব্রাহ্মসমাজের শক্তি ছিল না?

অতীতের ব্রাহ্মসমাজের আর একটী অলৌকিক কীর্ত্তি—প্রেম ও ভক্তির আদান-প্রদান। এই আদান-প্রদানের ফলে সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে কি এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলাম, তাহা আমার লেখনী ও ভাষা বর্ণনা করিতে অক্ষম। তখন ব্রাহ্ম-সমাজের বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও যুবকগণ কেবলই ব্রহ্মসাধনার প্রভাবে নিজের পদাভিমান, ধনৈশ্বর্য্যের গরীমা, বিদ্যার অহঙ্কার পদ-দলিত করিয়া নিজকে তৃনাদপি সুনীচ মনে করিতেন।

আবার যুবকগণ বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদান করিতেন। এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য কি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মসমাজের বংশধরদিগের পথ-প্রদর্শনের জন্য অতীতের ব্রাহ্মসমাজ রাখিয়া যায় নাই?

সর্ব্বোপরি অতীতের ব্রাহ্মসমাজের এক অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ—ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী। এ প্রকার উপাসনা-প্রণালী কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি হিন্দু সমাজের পূজার্চ্চনার ভিতর থাকিয়া এ প্রকার তৃপ্তি লাভ

করিতে পারি নাই। খৃষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম মন্দিরে গিয়া তৃপ্তি পাই নাই। মুসলমানের মস্‌জিদেও তৃপ্তি হয় নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনার হৃদয়োন্মাদিনী শক্তি আমি কোন সম্প্রদায়ে দেখিতে পাই না। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে যেমন কীট পতঙ্গাদি আসিয়া তাহাতে পতিত হয়, ঠিক সেই প্রকার, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার ভিতর পড়িয়া কত জগাই মাধাই উদ্ধার লাভ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি চির অভ্যস্ত মদ্যপায়ী, এই উপাসনার প্রভাবের ভিতর পড়িয়া, মদ্যপান চির জীবনের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছে। দুই একটী ঘটনা নিম্নে লিখিতেছি।

একটী আশ্চর্য্য ঘটনা—অনেক বৎসরের কথা, আমি যখন ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও উমেশচন্দ্রের সহিত ঝামাপুকুরে বাস করিতাম, তখন প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের বাটীতে কীর্ত্তন হইত। একটী পেন্সন্-প্রাপ্ত ভীষণ মাতাল প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের বাটীতে আসিয়া কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। আমি তাহাকে মদ্যপান পরিত্যাগের জন্য কতই অনুরোধ করিতাম, কিন্তু কিছুতেই তিনি সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি এইরূপে কিছু দিন মদ্যপান করিতে করিতে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। আমি এত চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না। মানবের সহস্র চেষ্টা যাহা করিতে পারে না, ব্রহ্মশক্তির কণা যখন পাপীর হৃদয় স্পর্শ করে তখন তাহার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়, নিম্নলিখিত ঘটনাটি তাহার দৃষ্টান্ত।

বারাণসী দে নামক একটী যুবক দুর্দ্দান্ত মাতাল আমার বাটীর

নিকট পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও স্ত্রী প্রভৃতি লইয়া বাস করিত। আমি তাহার মদ্যপান-অভ্যাস পরিত্যাগ করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারিলাম না। বারাণসী আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া চলা ফেরা করিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ বেলা দুই প্রহরের সময় বারাণসীর বাটীতে ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল। এই সময়ে তাহার বাটীতে কোন পুরুষ ছিল না, সকলে কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া আমি এবং আমার সহধর্ম্মিণী তাহার বাটীতে গিয়া দেখিলাম যে, তাহার পরমাসুন্দরী স্ত্রী অজ্ঞানাবস্থায় উঠানে পড়িয়া আছে, আর তাহার চতুস্পার্শে স্ত্রীলোকসকল ক্রন্দন করিতেছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, তাহার স্ত্রী স্নান করিয়া একতালার ছাদে সিক্তবসন রৌদ্রে দিতে গিয়াছিলেন, এমন সময়ে বারাণসী মদ্যপান করিয়া কোথা হইতে অজ্ঞাতসারে তাহার স্ত্রীর পশ্চাৎ দিকে আসিয়া এমন জোরে ঠ্যালা দিয়াছিলেন যে, তাহার স্ত্রী উঠানে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়াছিল। এ প্রকার ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার আমি জীবনে কখন দেখি নাই। বারাণসী আমাকে দেখিয়া একটী ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। সেই পতিপ্রাণা সতী নারীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকিতে হইল না। ভগবান্ সেই সতী নারীকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া, সামান্য একটু সেবা শুশ্রূষা করিতেই সেই নারী অক্ষত শরীরে সজ্ঞানে উঠিয়া বসিল এবং স্বামীর দুরবস্থা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। এইরূপে বারাণসী মদ্যপান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আজ ১১ই মাঘের উৎসব, শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করিতেছেন।

কত জগাই মাধাই আজ উদ্ধার হইবে। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, বারাণসীর সতী স্ত্রীর ক্রন্দনে কি ভগবান্ বিচলিত হন নাই? আজ কি বারাণসী ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আত্মবিসর্জ্জন করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে। বারাণসী প্রাতঃকালে সিমলা শোণ্ডিকালয় হইতে খোঙ্গারা ভাঙ্গিয়া যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন তিনি (আমি তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম) "শালারা কি করিতেছে", এই সকল কুবাক্য মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে সমাজ-মন্দিরের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত,—মুখ হইতে মদের গন্ধ বাহির হইতেছে। দ্বার রক্ষক প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন।

বারাণসী তাহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া প্রবেশের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। বারাণসী আজ ব্রহ্মনামে উদ্ধার পাইবে বলিয়া দ্বাররক্ষককে ঠেলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। সেই সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাসনার প্রভাবে উপাসকগণ, গভীর আত্মগ্লানিতে বিচলিত হইয়া, ক্রন্দন-ধ্বনিতে ব্রহ্মমন্দির বিকম্পিত করিতে-ছিলেন। বারাণসী একেবারে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভূতলে শয়ন করিল এবং অতীতের পাপ স্মরণ করিয়া আত্মগ্লানিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সমাজ ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু বারাণসী আজ হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিল। ব্রাহ্মসমাজ, তুমিই ধন্য তোমার ক্রোড়ে কত বারাণসী উদ্ধার পাইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে! বারাণসী আজ অল্প কয়েক বৎসর হইল পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। সে যতদিন জীবিত ছিল সমাজে আসিয়া নিয়মিত উপাসনা করিয়া যাইত। ইহা কি ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব নয়?

আর একটী ঘটনা—একটী অশীতিপর হিন্দুরমণী ভারতের সর্ব্ব

তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও পূজার্চ্চনা তাঁহাকে দেখাইবার জন্য তাঁহার এক আত্মীয়কে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার আত্মীয় তাঁহাকে ঠিক ১১ই মাঘের উৎসবদিনে প্রাতঃকালে মন্দিরে আনয়ন করিলেন। তিনি গাত্রে নামাবলী পরিয়া বেদীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা আরম্ভ করিয়া যখন সকল উপাসককে উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন, তখন সেই বৃদ্ধা হিন্দু রমণী, আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, করযোড়ে বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে উপাসনা-শেষে যখন বেদীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন তিনিও বেদীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিলেন এবং নয়নাশ্রু ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি ভারতের সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এ প্রকার জীবন্ত তীর্থ আমি কখনও দেখি নাই, আজ আমার জীবন ধন্য হইল। আমার যাহা কিছু আছে তাহা এই পুণ্যতীর্থে দিয়া যাইব"। তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গ্যাসের আলোর জন্য ৫০০৲ টাকা দান করিলেন। এ কি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার প্রভাব ও কীর্ত্তি নহে?

অতীতের ব্রাহ্মসমাজের আর একটী কীর্ত্তি, যাহা সকল সম্প্রদায়ের ভিতর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই—আমাদের আচার্য্যগণ ব্রাহ্ম-চরিত্র সংগঠনের উদ্দেশে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সাধু সহবাস করিবার জন্য সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান করিতেন। এই সকল উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, সেই সময়ে ব্রাহ্মদিগকে অরণ্যে বা পর্ব্বতে গিয়া সাধু অন্বেষণ করিতে হইত না। কলিকাতা ও মফঃস্বলে অনেক চরিত্রবান্ ব্রাহ্ম সাধনাদ্বারা এমন সিদ্ধিলাভ

করিয়াছিলেন যে, সেই সময়ে অনেক ধর্ম্মপিপাসু সাধক, সাধু-সহবাস লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদের নিকট গমন করিতেন। সেই সকল সিদ্ধপুরুষ আর এ জগতে নাই। এখনও দুই একটী সুপক্ক ফল ব্রাহ্মসমাজ-রূপ বৃক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। জানি না কোন্ দিন সেই ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাইবে !! ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, এ কি ব্রাহ্মসমাজের গৌরব নহে ?

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও ব্রাহ্মসমাজ।

আমাদের পূজনীয় আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ যখন বেলঘরিয়া উদ্যানে নির্জ্জন সাধন ভজন করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমরা অনেকেই পরমহংসদেবের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। আমাকে তিনি বড়ই স্নেহ করিতেন। শ্রীযুক্ত

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত রামকৃষ্ণ-কথামৃত নামে একখানি পুস্তক এবং তাঁহার অন্যান্য শিষ্যেরা তাহার আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের অনেক কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং সেই সকল বিষয় পুনরুক্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে আমার সঙ্গে তাঁহার যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সাধারণের পক্ষে অমূল্য জিনিস মনে করিয়া, সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনা লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি।

রামকৃষ্ণ দেব এক অসাধারণ ব্রহ্মশক্তি অন্তরে ধারণ করিয়া বর্দ্ধমানের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লেখা পড়া ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই। অতীতের পল্লীগ্রামস্থ ছেলেরা যতটুকু লেখা পড়া শিক্ষা করিত, তাহাও অতি সামান্যই শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাণী রাসমণীর দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাটীর পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি ঠাকুর পূজার্চ্চনা করিবার জন্য আসিলেন। পার্থিব সুখ ঐশ্বর্য্যের উপর তাঁহার বাল্যকালে অনাস্থা ছিল। প্রথম হইতেই বৈরাগ্য তাঁহার চরিত্রের লক্ষণ জানিতে পারিয়া, তাঁহার পিতা, তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। "বান্দা ভাবেন এক প্রকার আর খোদা করেন অন্য প্রকার"। তাঁহার পিতার বুদ্ধি কৌশল ভগবান্ একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া মানবের মঙ্গলের জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি ঠাকুরপূজার্চ্চনারূপ বাহ্যিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজে নির্জ্জন সাধনভজনে নিযুক্ত হইলেন।

যখন ব্রহ্মানন্দ শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাটীতে রামকৃষ্ণ নামে একটী ভক্ত সাধু অবস্থিতি করিতেছেন, তখন ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বেলঘরিয়ার উদ্যানে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন এবং পরস্পরে মুগ্ধ হইয়া উভয়ে একটী আধ্যাত্মিক যোগে আবদ্ধ হইলেন। আমার বোধ হয়, কেশবচন্দ্রই তাঁহাকে পরমহংস উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ দেব সেই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক এবং অন্যান্য সাধু চরিত্রের লোকসকল

তাঁহাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। মহর্ষিদেব ও আদি সমাজ দর্শন করিয়া, পরমহংসদেব বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সেই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হয় নাই এবং নরেন দত্ত, যিনি পরে বিবেকানন্দ নামে অভিহিত হইয়া সকল নরনারীর পূজনীয় ও আদৃত হইয়া গিয়াছেন, সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না জানি না।

রামকৃষ্ণ দেব বড়ই শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্ত্রী কি পুরুষ, যিনি একবার তাঁহার মুখের কথা শুনিতেন, তিনি তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিতেন না। আমি অনেক বৎসর তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া অনেক ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহাকে কখন কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা বা কুৎসা করিতে শুনি নাই। সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তিনি আপনার বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিতেন। তিনি সামান্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও, নিজে সাধন ভজন ও পরাবিদ্যা দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সকল প্রকার ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে উদাহরণ দিয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। সামান্য সামান্য চলিত কথা দ্বারা উদাহরণ দিয়া সাধারণ লোকদিগের মন প্রাণকে আকৃষ্ট করা, তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষ লক্ষণ ছিল। তিনি অত্যন্ত তোত্‌লা ছিলেন। বাহ্যিক বেশ ভূষার উপর তাঁহার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই হরিপ্রেমে এমনই মগ্ন থাকিতেন যে, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানি অঙ্গে আছে কি না, কিম্বা কোঁচা কোন দিকে বা কাছা কোন দিকে দিতে হইবে, বা বিনামা কোথায়, এই সকলের বাহ্য জ্ঞান একেবারে

তাঁহাতে দৃষ্ট হইত না। বস্ত্রখানি কোন প্রকারে অঙ্গে জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিতেন।

হৃদয় নামক ঠাকুরবাটীর কর্ম্মচারীকে (ইনি সম্বন্ধে পরমহংস দেবের ভাগিনেয় হইতেন) সর্ব্বদাই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে দেখিতাম। রামকৃষ্ণ দেব সর্ব্বদা ইহাকে "হৃদে শালা" বলিয়া ডাকিতেন। তিনি "শালা" কথাটা প্রায়ই সকল ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু লোকদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন। আমি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, এই কথাটা কেন সকল লোকের উপর ব্যবহার করেন? তাহাতে তিনি বলিলেন, "এই সকল লোক একটা হুজুক দেখিবার জন্য ও আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য এখানে আসে। ক'টা লোক ধর্ম্মের কথা শুনিতে আসে? এক কাণ দিয়া শোনে অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। সুতরাং উহাদের পরীক্ষার জন্য এই কথাটি ব্যবহার করি।" লোক পরীক্ষা করিবার তাঁহার একটা বিশেষ শক্তি ছিল। কোন্ লোক কি উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আসিতেন, তিনি তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন। বিশেষতঃ সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার নিকট আসিলে, তাঁহাদিগকে কর্কশ বাক্য দ্বারা তাড়াইয়া দিতেন। আমি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন উহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন"? তিনি উত্তর দিলেন, "উহারা কামিনী-কাঞ্চন লইয়া থাকিতে ভালবাসে, ধর্ম্মের কথা উহারা ভাল করিয়া চিন্তা করে না, এক কাণ দিয়া শোনে আর অপর কাণ দিয়া বাহির করিয়া দেয়। কেমন জানিস্? আমাদের চলিত কথায় বলে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'। ওরা মাছ ধরিতে চায়, অথচ গাত্রে জল বা কাদা লাগিবে

না। ওরা স্ত্রীকে ভাল ভাল রঙ্গিন কাপড় পরাইবে, মুখে ঠোঁটে ও পায়ে আল্‌তা পরাইবে, ভাল ভাল গহনা পরাইবে, আবার ধর্ম্মের কথা শুন্‌তে আসে; ধর্ম্ম জিনিষটা কি এত সহজ যে একবার আমার কাছে শুনিলেই ধার্ম্মিক হইয়া যাইবে"? তাহাতে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমরাও ত কামিনী-কাঞ্চন লইয়া থাকি, কৈ আমাদের ত তাড়াইয়া দেন না?" তিনি বলিলেন "তোরা আর ওরা সম্পূর্ণ পৃথক্। তোদের প্রাণে একটা ব্যাকুলতা আছে, সরলতা আছে, স্বার্থত্যাগ আছে, তোরা একদিন না একদিন কামিনী-কাঞ্চন ছাড়িতে পারিবি; কিন্তু ওরা কখনও পারিবে না। দেখ্‌ না, তোদের ভিতর শিবনাথ কি প্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়াছে"! এই প্রকার কত কথা সেই মহাত্মা সিদ্ধপুরুষের চরণপ্রান্তে বসিয়া শুনিতাম, তাহা এখন স্মরণ করিয়া লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে নিতান্ত যাহা সাধারণের পক্ষে অমূল্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ এতদিন বোধ হয় জানিতে পারেন নাই, তাহাই লিখিতেছি। পরমহংসদেব সংকীর্ত্তন করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার কণ্ঠের স্বরও বেশ সুমধুর ছিল, কিন্তু তিনি সচরাচর কথা বলিবার সময় যে প্রকার তোৎলা কথা বলিতেন, কীর্ত্তনের সময় তাহা থাকিত না। তিনি কালীভক্ত ছিলেন; কারণ, যখনই তিনি কীর্ত্তন করিতেন, কালী-কীর্ত্তন করিতেন। তিনি কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবেশে একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। আমি অনেকবার তাঁহার ভাবাবেশ দেখিয়াছি। তাঁহাকে সজ্ঞান করিবার একমাত্র ঔষধ ছিল "ওঁ" বা "ওঁ ব্রহ্ম"। তাঁহার কাণের কাছে দুই চারি বার "ওঁ ব্রহ্ম" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি ক্রমে ক্রমে সজ্ঞান হইতেন। আমি যখন ২৮নং ঝামাপুকুরে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও উমেশচন্দ্রের

সহিত সপরিবারে বাস করিতাম, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরমহংসদেব নরেনকে সঙ্গে লইয়া প্রায়ই আমাদের ওখানে আসিতেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের সহিত একত্রে কীর্ত্তন করিতেন। উপস্থিত শ্রোতাগণ সেই অপরূপ ভক্তি ও প্রেমের লীলা দর্শন করিয়া সকলেই আত্মহারা হইয়া যাইতেন। সেই অতীতের ভক্তগণের প্রেমলীলা কি জীবনে আর দেখিতে পাইব!

অতীতকালে ব্রাহ্মসমাজে একদিকে ব্রহ্মানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রচারকগণ এবং অন্যান্য ভক্তগণ অপর দিকে রামকৃষ্ণ, এই উভয়ের সম্মিলনে এক অপূর্ব্ব প্রেম ও ভক্তির স্রোত ব্রাহ্মসমাজে প্রবাহিত হইয়াছিল। পরমহংসদেব ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে করিতে তাঁহার প্রাণেও একটী অভূতপূর্ব্ব অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যাহা পাঠক পাঠিকা সকলে তাঁহার মুখনিঃসৃত নিম্নলিখিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারিবেন। তিনি প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে আসিয়া যোগদান করিতেন। বিশেষতঃ সিন্দুরিয়াপটী মণিলাল মল্লিকের বাটীতে যে বাৎসরিক উৎসব হইত, তাহাতে আসিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। কেন না, সেখানে কোন বৎসর ব্রহ্মানন্দ, কোন বৎসর শাস্ত্রী মহাশয়, উপাসনা করিতেন। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার ভিতর প্রবেশ করাতে, তাঁহার অন্তরে একটী উচ্চ আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল। একদিন তিনি বলিলেন, "ও রে ত্রৈলোক্য, তোদের উপাসনা খুব ভাল, কেবল একটা আমার ভাল লাগে না"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বিষয় আপনার ভাল লাগে না?" তিনি বলিলেন, "তোরা ভগবান্‌কে বড় খোসামোদ করিস। এত খোসামোদ আমি ভালবাসি না"। তাহাতে আমি

বলিলাম, "ভগবানের আরাধনা করিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপসকল, ভাল করিয়া ব্যাখ্যা না করিলে, উপাসকমণ্ডলী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না বলিয়াই আচার্য্য এমন করিয়া সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন"। তাহাতে তিনি বলিলেন, "অত বেশী করিয়া বলিবার দরকার নাই।"

আমি প্রায়ই পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহবাস লাভ করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতাম। যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, তখনই বলিতেন, "তোদের, মহর্ষি ও কেশব এক একটা লোক" অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ। আবার কিছু দিন পরে বিজয়কৃষ্ণ, অঘোর ও শিবনাথের নাম করিয়া বলিতেন যে "উহারা এক একটা লোক"। এইরূপে তিনি বলিতেন, আমি শুনিতাম। তিনি কালী-কীর্ত্তন করিতে করিতে অচেতনও হইতেন, আবার "ওঁ ব্রহ্ম" নাম শুনিতে শুনিতে সচেতন হইতেন। এই উভয় ব্যাপারে আমার মনে একটা খটকা বা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এক দিন সন্ধ্যার একটু অগ্রে আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখি যে, পরমহংসদেব সুন্দর বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া অর্থাৎ কালাপেড়ে কোঁচান কাপড় পরিয়া বসিয়া আছেন এবং সম্মুখে একজোড়া চিনের বাড়ীর বার্ণিস চটি জুতা রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে দেখিয়া কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহাতে তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ঐ হৃদে শালা আজ আমাকে বাবু সাজাইয়াছে, তুই এখানে বস্"। আমি বসিলে তিনি তাঁহার বাবু-আনার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া বলিলেন, "কেমন জানিস্, কাঁঠাল ভাঙ্গিবার অগ্রে যদি

হাতে তৈল দিয়া ভাঙ্গা যায়, তাহা হইলে আটা আর হাতে লাগে না। তোদের বাবু-আনা আর আমার বাবু-আনা দুটো আলাদা জিনিষ; তোরা বাবু-আনা করতে গিয়া একেবারে জড়িয়া মরিস্, আর আমার কিছুই হয় না"। বাস্তবিক ভক্তের কথা কি কখন মিথ্যা হয়? কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ যখন তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কোথায় তাঁর সুন্দর কোঁচান বস্ত্র, আর কোথায় বা তাঁহার বিনামা? সকলই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আর একদিন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমাকে বলিলেন, "ও রে, আমার মা আমার সেবা করিবার জন্য আসিয়াছে, ঐ ঘরের ভিতর আছে, তুই একবার আমার মাকে দেখ?" আমি বলিলাম, "আপনার মা ত অনেক দিন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এখন আপনার মা কোথা হইতে আসিলেন?" তিনি বলিলেন, "জগতের স্ত্রীলোক মাত্রই আমার মা।" তখন আমি বুঝিতে পারিলাম উঁহার সহধর্ম্মিণী আসিয়াছেন। আমি বলিলাম, "আপনি ত স্ত্রীলোকদিগকে উপদেশ দেন যে 'পতি-সেবাই তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম', উনি পতি-সেবার জন্যই আসিয়াছেন, ইহাতে ত আপনি উঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারেন না।" তখন তিনি বলিলেন, "আমার সে অবস্থা অতীত হইয়াছে। তবে আমি উঁহাকে বলিয়াছি, দূরে দূরে থাকিয়া আমার সেবা যতটা পার করিও, কিন্তু কখন আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না"। বাস্তবিক আমি দেখিয়াছিলাম, তিনি সিদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন।

আর একদিন সন্ধ্যার সময় দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট উপস্থিত

হইলাম, কত সস্নেহে আমাকে কাছে বসাইয়া কত ভাল ভাল ধর্ম্মের কথা শুনাইলেন। তাঁহার কাছে বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা হইত না। এমন সময়ে কালীর মন্দিরে আরতি আরম্ভ হইল। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে, একবার আরতি দেখিব। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার সঙ্গে গিয়া আজ কালীর আরতি দেখিব বড় ইচ্ছা হইয়াছে।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তুই ব্রাহ্ম, কালীর আরতি দেখ্‌বি কি করে?" আমি বলিলাম, "দেখ্‌তে দোষ কি? আপনি আসুন, একত্রে যাইয়া দেখিয়া আসি।" তিনি বলিলেন, "আমি ঐ শালীর মুখ আর দেখি না, তুই একলা গিয়া দেখিয়া আয়।" আমি বলিলাম, "আমি ব্রাহ্ম, যদি কেহ কিছু বলে, সেইজন্য আপনার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা"। তিনি কোন প্রকারে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "তুই নীচে জুতা রাখিয়া উপরে গিয়া আরতি দেখিস্, কেহ কিছু বলিবে না"। আমি তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিয়া আরতি দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও রে, কেমন দেখ্‌লি?" বলিলাম, "বড় সুন্দর।" ইহাতে আমার মনটা বড় অস্থির হইল, কেবলই মনে হইতে লাগিল পরমহংসদেব এত কালী ভক্ত, কেন কালীর আরতি দেখিতে গেলেন না? পরদিন খুব প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গার ধারে সুন্দর বাঁধান চাতালে বসিয়া সঙ্গীত ও উপাসনা করিতেছি, এমন সময়ে একটী লোক আসিয়া আমাকে বলিল, "পরমহংসদেব আপনাকে ডাকিতেছেন।" আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি গাড়ুটী হস্তে লইয়া আমাকে বলিলেন, "তুই আমার সঙ্গে আয়"। আমি বলিলাম,

"আপনি বাহ্যে যাইতেছেন, আমি আপনার সঙ্গে কোথায় যাইব" ? তিনি বলিলেন, "তুই আমার সঙ্গে আয় না"। আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি উত্তর দিকে ফটক হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে একটী বাঁধান বটগাছের ধারে গেলেন এবং গাড়ুটী নিম্নে রাখিয়া সেই বাঁধান বৃক্ষে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিম্নলিখিত অনন্যসাধারণ ও অলৌকিক কথাসকল বলিতে লাগিলেন। পাঠক পাঠিকা ও তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ, এই সকল কথা—যাহা স্মরণ করিলে সর্ব্বশরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে—তাঁহার সাধনের চরমাবস্থার কথা ও তাঁহার মুখ নিঃসৃত ব্রহ্মবাণী, সকলে শ্রবণ করুন।

তিনি স্বর্গের দেবতা, স্বর্গের কথা বলিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। "দেখ্ ত্রৈলোক্য, কাল যে তুই আমাকে আরতি দেখ্‌বার জন্য বলিয়াছিলি, আমি অনেক দিন ধরিয়া ঐ শালীর মুখ দেখি না"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন দেখেন না" ? তিনি বলিলেন, "অনেক দিন ধরিয়া ঐ শালা আমাকে পথ ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছিল, আমাকে ঠিক পথ দেখাইয়া দেয় নাই, সেই জন্য আমি আর ওর মুখ দেখি না।" তার পর তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখ ঐ যে ভাঙ্গা চালা ঘরটী দেখ্‌ছিস্, ঐ ঘরে আমি গু মূত মাখিয়া পড়িয়া থাকিতাম, আর হৃদে আসিয়া আমাকে পরিষ্কার করিয়া দিত এবং আমাকে আসিয়া খাওয়াইত। এইরূপে অনেক দিন যাবৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য ডাকিতেছিলাম, এমন সময়ে এক দিন গভীর রাত্রে কে যেন আসিয়া আমাকে ডাকিল—'তোকে ঐ গঙ্গার ধারে, তোর অনেক দিনের বাঞ্ছিত ধন দেখিবার জন্য কে

ডাকিতেছেন'। আমি কোন প্রকার বিলম্ব না করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া গঙ্গার ধারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আবার কে যেন বলিল 'আর একটু নীচে আয়, এখানে বস্', আমি বসিলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, আমার মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। তৎপরে আমাকে বলিলেন—'তোর্ চির বাঞ্ছিত তপস্যার ধন একবার দেখ্'? আমি দেখিলাম যে, এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় রূপ আমার প্রাণ মনকে এক আশ্চর্য্য জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ করিল। অল্পক্ষণ প্রকাশিত হইয়া আবার কোথায় চলিয়া গেলেন। আমি আবার দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিলাম যে, আর কি দেখা দিবে না? তাহাতে উত্তর পাইলাম, 'তুই যখন ডাক্‌বি আমাকে পাইবি'। পরমহংসদেব যখন এই সকল কথা আমাকে বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার দুই গণ্ড দিয়া প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। আমি সেই সময় সেই সিদ্ধ পুরুষের মুখের এক অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, গলদশ্রু-লোচনে কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া, তাঁহার চরণ তলে বসিয়া পড়িলাম। আবার বলিলেন, "এমন সৌন্দর্য্য আমি মুখে বলিয়া প্রকাশ করিতে পারি না, আমি ধন্য হইয়াছি।" যখন এই সকল কথা তাঁহার মুখ হইতে শুনিলাম, তখন আমার পূর্ব্বদিনের মনের খট্‌কা বা সন্দেহ একেবারে চলিয়া গেল। এখন পাঠক পাঠিকাও তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের ব্রহ্মদর্শন একবার চিন্তা করুন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর ভিতর বসিয়া, অপরা শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া, এই সিদ্ধ পুরুষকে কেহ চিনিতে পারিবেন না। অতীতের ব্রাহ্মসমাজ এক দিকে রামকৃষ্ণ দেব অপর দিকে ব্রহ্মানন্দ, মহর্ষি প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষদিগের

আদান প্রদান ও ঘাত প্রতিঘাতে এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিল। পরমহংসদেবের মন্ত্র-শিষ্য আমি কখন দেখি নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সাধারণ হিতকর উপদেশ দিতেন। চরিত্রের বিশুদ্ধতা, সত্যপরায়ণতা, সরলতা, কার্য্যে একনিষ্ঠতা, মানবের সেবা ও স্বার্থত্যাগ তাঁহার উপদেশের সার ছিল। সেই মুক্ত যোগী রামকৃষ্ণ দেবের ধর্ম্মপ্রভাবে আজ তাঁহার ভক্তগণ নিজ নিজ সুখ-সচ্ছন্দতা, পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া, নরনারীর সেবার জন্য এই ভারতের নানাস্থানে দীন দুঃখী আতুরদিগের জন্য অনাথাশ্রম-সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া, সাধারণ নরনারীর কত প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন! প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার যে সকল উক্তি আমি শুনিয়া খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কয়েকটি অমূল্য জিনিস নিম্নে লিখিয়া জানাইতেছি :—

পরমহংস দেবের উক্তি।

তিনটী টান একত্র হইলে ভগবানকে লাভ করা যায়। ১ম—বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান। ২য়—সতীর পতির প্রতি টান। ৩য়—মায়ের সন্তানের প্রতি টান। এই তিনটী টান একত্র হইলে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

ভাল মন্দ জীবেরই পক্ষে, সৎ অসৎ জীবেরই পক্ষে, ঈশ্বরের ওতে কিছু আসে যায় না। যেমন আলোর সম্মুখে কেহ ভাগবত পড়িতেছে, কেহবা জাল করিতেছে, কিন্তু প্রদীপ নির্লিপ্ত। সূর্য্য শিষ্টের উপর আলো দেয়, আবার দুষ্টের উপরও আলো দেয়। যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এসকল কি? ও সব

জীবেরই পক্ষে; ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কাম্‌ড়াইলে মরিয়া যায়, কিন্তু সাপের কিছুই হয় না।

ব্রহ্ম জিনিসটী আজ পর্য্যন্ত কেহ এঁটো করিতে পারিল না; কারণ, ইহা যে কি বস্তু কেহ মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র সমস্তই এঁটো হইয়াছে; কারণ, এই সকল মুখে উচ্চারণ করিয়া পড়া হইয়াছে।

ব্রহ্মদর্শন হইলে মানুষ নিস্তব্ধ হইয়া যায়, যতক্ষণ দর্শন না হয় ততক্ষণ বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ কল্‌কলানী। ঘি পাকিয়া গেলে আর শব্দ থাকে না।

যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে, ততক্ষণ ভন্‌ ভন্‌ করে; কিন্তু একবার ফুলে বসিলে চুপ হইয়া যায়।

পুকুরে কলসীতে জল ভরিবার সময় ভক্‌ ভক্‌ শব্দ হয়; কিন্তু কলসী ভর্ত্তি হইলে আর শব্দ থাকে না।

পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ দত্ত (যিনি পরে বিবেকানন্দ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন), যখন প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, তখন হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া নিয়মিত উপাসনা করিয়া যাইত। নরেন ভাল সঙ্গীত করিতে পারিত, তাহার কণ্ঠের স্বর বেশ সুমিষ্ট ছিল, সমাজে প্রায়ই সঙ্গীত করিত। সে শাস্ত্রী মহাশয়, বিজয়বাবু ও নগেন্দ্রবাবুর বিশেষ ভক্ত ছিল। সেই সময়ে পরমহংসদেব প্রায়ই সাধারণ সমাজে আসিতেন এবং শাস্ত্রী ও বিজয়বাবুর সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতেন। রামকৃষ্ণদেবের এই প্রকার সাধারণ সমাজে যাতায়াত এবং শাস্ত্রী প্রভৃতির সহিত ধর্ম্মালাপ, এই সকল দেখিয়া নরেন পরমহংসদেবের শিষ্য হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

অর্দ্ধ শতাব্দী অগ্রে শ্রদ্ধেয় শিবনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত হন নাই। সেই সময়ের কথা কিছু লিখিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার স্বরূপ দিতেছি। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে আত্ম-চরিত লিখিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা তাঁহার জীবনী লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং সেই সকল বিষয়ের পুনরুক্তি করা বাহুল্য মাত্র: তবে যাহা আমি সেই মহাপুরুষের চরিত্রে নিজে দেখিয়াছিলাম এবং তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম তাহার সামান্য দুই তিনটী ঘটনা লিখিতেছি।

ভগবানের মহান্ শক্তি দ্বারা যে এই বিশ্বের সামান্য হইতে বৃহত্তর কার্য্যসকল পরিচালিত হইতেছে, মানব তাহা প্রথমে চিন্তা না করিয়া, আশামরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া, মনে মনে কতই না আকাশ-কুসুম গঠন করে, এবং পরিশেষে হতাশ হইয়া

নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করে। শিবনাথবাবু পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। যখন তিনি প্রবেশিকা হইতে ক্রমশঃ এল, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার পিতা-মাতা ও আত্মীয়গণ কত ভবিষ্যৎ আশায় বুক বাঁধিয়া ছিলেন, "আমাদের এই সন্তান বি এ, এম্ এ পাশ করিয়া উচ্চ উপাধিতে ভূষিত হইবে, অনেক ধনোপার্জ্জন করিবে এবং আমরা দেশে দশজনের মধ্যে একজন হইয়া সাংসারিক পার্থিব সুখে সুখী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব।" কিন্তু কৈ ভগবান্ ত তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইলেন না, কিম্বা তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিলেন না। সেইজন্যই এই প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত যে, "বান্দা ভাবে এক প্রকার, আর খোদা করেন অন্য প্রকার" "man proposes, God disposes".

যেমন একটী বীজ ভূমিতে প্রোথিত হইলে, বাহিরের জল বায়ু ও তেজ ব্যতিরেকে উহা অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ রূপে পরিণত হয় না, সেই প্রকার শ্রদ্ধেয় শিবনাথবাবুর পাঠ্যাবস্থা হইতে তাঁহার জীবন-বীজ, বাহিরের নানাপ্রকার সাহায্যে একটু একটু করিয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া-ছিলাম যে, ভক্ত উমেশচন্দ্র তাঁহাকে একখানি প্রার্থনা-পুস্তক দিয়াছিলেন। সেই প্রার্থনা পুস্তকখানি তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তনের প্রধান সহায় হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে ভক্ত উমেশচন্দ্র তাঁহার গুরু ছিলেন। একদিকে সেই যোগনিষ্ঠ ব্রহ্ম-পরায়ণ মহর্ষিদেবের সহবাসপ্রভাব, অপর দিকে ব্রহ্মানন্দের সহবাসপ্রভাব। ব্রহ্মানন্দ ঠিক সেই সময়ে তাঁহার বাটীতে একটী ব্রহ্মাগ্নি-কুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিবনাথবাবু

সেই অগ্নিকুণ্ডে নিজের স্বার্থ, উচ্চাভিলাষ, পদগৌরব, বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মানন্দের নিকট ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তিনি দীক্ষিত হইয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, ব্রহ্ম সাধন ভজন ও উপাসনা দ্বারা নিজের জীবনকে সেই পাঠ্যাবস্থায় এমন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন যে, তাঁহার উপাসনা ও বক্তৃতা যাঁহারা শ্রবণ করিতেন, তাঁহারা সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। তিনি যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন, আমি দেখিয়াছি, তিনি কেবল কলেজের উপস্থিতি-পুস্তকে নাম স্বাক্ষর করিয়া ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে এখানে উৎসব, ওখানে বক্তৃতা শুনিয়া সমস্ত বৎসরটা কাটাইয়া বেড়াইতেন। তৎপরে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতেও এইপ্রকার ছয় সাত মাস কাল বেড়াইতেছিলেন দেখিয়া, উমেশচন্দ্র একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শিবনাথ, তুমি করিতেছ কি ? তোমার পরীক্ষার আর চারি পাঁচ মাস বাকী আছে, তুমি এমন করিয়া পড়াশুনা না করিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইলে, পরীক্ষায় কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইবে ?" আরও শুনিয়াছিলাম, তাঁহার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীও তাঁহাকে অনেক সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। যখনই তাঁহার কর্ণে এই সকল কথা প্রবেশ করিল, তখনই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, পরিবারদিগের ভার অপরের হস্তে প্রদান করিয়া, সংস্কৃত কলেজের দ্বিতল গৃহে যে লাইব্রেরী আছে এবং তাহার পার্শ্বে যে বারাণ্ডা আছে, তাহাতে গিয়া আড্ডা গাড়িলেন। সেই সময়ে তাঁহার যকৃতের দোষ, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ ও জ্যাবাসংযুক্ত হইয়া প্রতিদিন জ্বর ভোগ করিতেছিলেন। যুবক শিবনাথ কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন। ভক্ত উমেশচন্দ্র শিবনাথের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা

করিয়া দিলেন এবং আমাকে প্রতিদিন ঔষধ ও পথ্য লইয়া সংস্কৃত কলেজে দিয়া আসিবার ভার প্রদান করিলেন। আমি গিয়া দেখি যে তিনি একখানি বেঞ্চেতে বসিয়া পড়িতেছেন। সম্মুখে একটী বাতিদানে বাতি রহিয়াছে। তোষক নাই, বালিস নাই, পুস্তকে মাথা দিয়া দুই এক ঘণ্টা ঘুমাইতেন। তিনি "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই মহামন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগ্নিতে আপনাকে অর্পণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন। দেখিয়াছিলাম, তিনি চারি পাঁচ মাস কাল আত্মীয়স্বজনের মুখদর্শন পর্য্যন্ত করেন নাই, কেবলই বিদ্যার্জ্জনের তপস্যা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার সময় যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাঁহার আত্মীয়দিগের মুখে শুনিতে লাগিলাম যে, "শিবনাথ এবার পাশ হইবে না"। অবিশ্বাসী ও ভ্রান্ত মানবের কি দুর্দ্দশা! বর্ত্তমানের চিন্তা না করিয়া কেবল ভবিষ্যৎ চিন্তায় মনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। যুবক শিবনাথ কি তোমার আমার মত সাধারণ সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? না, ব্রাহ্মসমাজে একটী আদর্শজীবন দেখাইবার জন্য দেবতারূপে এই বঙ্গদেশের একটী সামান্য পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? যিনি সাধনা ও তপস্যা দ্বারা পরম পুরুষকে হৃদয়স্থ করিতে অভ্যাস করেন, তাঁহার নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া অতিসামান্য বলিয়া মনে হয়। ভগবানের নামে কি অসম্ভব সম্ভব হয় না? তবে ভক্ত এই সঙ্গীতটী কেন রচনা করিয়াছিলেন? "ঐ দয়ালনামের এমনি গুণ হে, অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবায় গীত গায়, বধির শুনে হে"। এ কি তবে মিথ্যা কথা? মিথ্যা নয়। পাঠক পাঠিকা, ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা, একটু ধৈর্য্যাবলম্বন

করিয়া অপেক্ষা করুন। শিবনাথ বাবু সুস্থ শরীরে পরীক্ষা দিলেন। তাঁহার বন্ধু-বান্ধব পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া রহিলেন। পরিশেষে কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম সর্ব্বোচ্চস্থানে রহিয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে এক হুলুস্থুল ও মহা আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। তিনি বি, এ, পাশ করিয়া প্রায় একশত টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তৎপরে সংস্কৃতে এম, এ দিবার জন্য তিনি এবং তাঁহার সহপাঠী বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ একত্রে ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে (এখন যেখানে সিটি-কলেজিয়েট স্কুল আছে) ত্রিতলগৃহে অবস্থিত করিয়া পুনরায় আবার পড়াশুনা আরম্ভ করিলেন এবং এম, এ, পরীক্ষা প্রদান করিলেন। আবার গেজেটে তাঁহার নাম সর্ব্বোচ্চস্থানে রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার বন্ধু-বান্ধব সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শাস্ত্রী-উপাধীতে ভূষিত হইলেন। এখন জিজ্ঞাস্য, ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা, শাস্ত্রী মহাশয় "মন্ত্রের সাধনব্রত" অবলম্বন পূর্ব্বক যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সে বিদ্যা কি পরা না অপরা-বিদ্যা, বা রজ ও তম গুণাশ্রিত বিদ্যা না সত্ব গুণাশ্রিত বিদ্যা? আপনারা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

আর একটী ঘটনা লিখিবার পূর্ব্বে, তিনি বাল্যকাল হইতে কি প্রকার স্বাধীনভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তাহা লেখা প্রয়োজন। আপনারা প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, তিনি বাল্যকাল হইতে সংস্কৃত কলেজে পাঠাভ্যাস করিতেন। আমি শুনিয়াছি যে, তিনি, তাঁহার অসাধারণ মেধা প্রভাবে, নিম্ন শ্রেণী হইতেই বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। সেই বৃত্তির

টাকা হইতে তিনি কলিকাতার খরচ পত্র চালাইয়া লইতেন। তিনি পিতামাতা বা কোন আত্মীয়ের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তিনি এক হস্তে পুস্তক লইয়া পাঠাভ্যাস করিতেন, অপর হস্তে রন্ধন করিতেন। তাঁহার পিতৃদেব বড় গর্ব্বিত ও স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। শিবনাথবাবু ইচ্ছা করিয়া পিতাকে সাহায্য করিতে চাহিলে, তাঁহার পিতা, পুত্র বিধর্ম্মী হইয়াছে বলিয়া, গ্রহণ করিতেন না।

এক সময়ে শাস্ত্রী মহাশয় অতি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আম্‌হার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একটী বাটী ভাড়া করিয়া সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সকলের পরামর্শানুসারে দ্বারকানাথ কবিরাজকে দেখান আবশ্যক মনে করিলেন। তাঁহার পিতা-মাতা সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। মাতা সন্তানের পার্শ্বে বসিয়া গাত্রে হস্ত বুলাইতেছেন, আর পিতা পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া আছেন। দ্বারিক কবিরাজ আসিয়া রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এমন সময় শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা ট্যাঁক হইতে ৪৲টী টাকা বাহির করিয়া কবিরাজের ভিজিট দিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতার হস্তে অর্পণ করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত পিতামাতার সম্মুখে বলিলেন, "বাবা আমার টাকা স্পর্শ করেন না, আমি বাবার টাকা স্পর্শ করিব না।" ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা বলিয়াছিলেন, "তুই ঠিক আমার ব্যাটা বটে।" একটা প্রচলিত কথায় বলে, "যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেতুল।" পিতা পুত্র উভয়েই তেজীয়ান ও সত্য-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা মুখ হইতে যে সকল কথা বাহির

করিতেন তাহা আজীবন কার্য্যে পরিণত করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা, "পশ্চাৎ ফিরিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেন আর তাঁহার নাম ধরিতেন না।" ইহার অর্থ কি? শাস্ত্রী মহাশয় যখন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতা দুইটী কথা মুখ হইতে উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"উহার মুখ দেখিব না, উহার নাম করিব না।" সত্যপরায়ণ পিতা আজীবন এই সত্য পালন করিয়া গিয়াছেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেন। 'সেটা' 'ওটা' নামে তাঁহার উল্লেখ করিতেন।

আর একটা ঘটনা—আমাদের শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় সাধনা দ্বারা ইচ্ছাশক্তিকে কি প্রকার আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের এই ঘটনাটিতে সকলে বুঝিতে পারিবেন। বহু বৎসর পরে আবার পীড়িত হইয়া ভবানীপুর হইতে চিকিৎসার জন্য স্বর্গগত মোহিনীমোহন বসু মহাশয়ের বাটীতে আসিয়াছিলেন। কঠিন পীড়া, জীবনের আশা বড় ছিল না। তাঁহার জননী শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতেছেন, পিতৃদেব চিন্তাকুলহৃদয়ে বসিয়া আছেন, তাঁহার ভক্তদিগের বিষণ্ণবদন। ভগবান্ যাঁহাকে রক্ষা করেন যমের সাধ্য নাই যে তাহাকে স্পর্শ করে! সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সুস্থ হইয়া একদিন আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া নানাপ্রকারের আমার পারিবারিক সংবাদ লইতে লইতে হঠাৎ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, ত্রৈলোক্য? আমি এবার যমের সঙ্গে লড়াই করিয়া রক্ষা পাইয়াছি"। আমি বলিলাম, "সে আবার কি প্রকার, মহাশয়"? শাস্ত্রী মহাশয়ের

ইচ্ছাশক্তি খুব প্রবল। তিনি বলিলেন, "এবার আমার পীড়ার সময় বাহ্যজ্ঞান ছিল না বটে, কিন্তু অন্তরজ্ঞান বেশ ছিল। যম আসিয়া যখন বলিল, 'তোমাকে এখনই যাইতে হইবে', আমি বজ্রগম্ভীরস্বরে যমকে বলিলাম, 'আমি কখনই যাইব না, এখনও আমার অনেক কাজ করিতে বাকী আছে; তুমি দেখিতেছ না যে, আমার স্নেহময়ী মাতা ও স্নেহময় পিতা মস্তকের কাছে বসিয়া আছেন, আমি তাঁহাদিগকে কষ্ট দিয়া কখনই যাইব না। তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। যম আমার এই বজ্রগম্ভীর বাক্য শুনিয়া কোথায় পলাইয়া গেল, আর দেখিতে পাইলাম না।" এই প্রকার কত ঘটনা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি।

শাস্ত্রী মহাশয় কি প্রকার সত্যপরায়ণ, স্বাধীনচেতা ও পরোপকারী পিতার রক্ত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃদেবের দুই একটী ঘটনা লিখিয়া তাহা সকলকে জানাইতেছি। তাঁহার পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। নাম ছিল হরানন্দ ভট্টাচার্য্য। গ্রামে পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি আজীবন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া, খুব স্পষ্টবক্তা লোক ছিলেন, এবং কাহাকে দৃক্পাত বা গ্রাহ্য করিতেন না। এক সময়ে তাঁহাদের গ্রামে দুর্দ্দান্ত দত্ত জমিদারেরা দুঃখী গরীব প্রজাদের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেন। তিনি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, পথে একজন লোককে জমীদারের অত্যাচারের কথা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই লোকটী জমীদার-বাবুর বাটীতে গিয়া, পণ্ডিত মহাশয়ের সমস্ত কথাগুলি বলায়, জমীদারবাবু ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "কি হরানন্দ পণ্ডিত আমাদিগকে এমন কথা বলে, সে জানে না যে আমরা কে?

দাঁড়াও, পণ্ডিতের ভিটায় কাওয়ারা বসাইব"। (আমাদের দেশে কাওয়ারা জাতি অতি নীচ ও অস্পৃশ্য)। পণ্ডিতমহাশয় কোন প্রকারে জমীদারের মুখের কথাগুলি শুনিয়াছিলেন। যেই শুনা, তৎক্ষণাৎ কালবিলম্ব না করিয়া, সেই নির্ভীক সত্যপরায়ণ ও পরোপকারী পণ্ডিত মহাশয় প্রায় বেলা ১২টার সময় সেই জমীদারের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। জমাদারবাবু সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসিতে বলিয়া এত বেলায় তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "ও হে, তুমি নাকি বলিয়াছ, আমার ভিটাতে কাওয়ারা বসাইবে? তাই আমি একটা কথা তোমাকে বলি যে, আমার ভিটায় কাওয়ারা বসাইতে হইলে, তোমাকে আবার কাওয়ারা পাড়ায় যাইতে হইবে, তাহাদিগকে আনিতে হইবে; এত কষ্ট করিবার দরকার কি? তা আমি বলিতেছি, তুমি নিজে গিয়া বসিলেই হইবে"। তখন জমাদার বাবু পণ্ডিত মহাশয়ের এই সকল কথা শুনিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া, পণ্ডিত মহাশয়কে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। মানব সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে জগতে কাহাকে দেখিয়া ভীত হয় না।

শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা আমাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের সংবাদ লইবার জন্য প্রায়ই কলিকাতায় আসিতেন। প্রথমে আমার নিকট আসিয়া তাঁহার সংবাদ লইতেন। তিনি প্রায় রবিবার কলিকাতায় আসিতেন। একবার তাহার পূর্ব্ব দিন শনিবার শাস্ত্রী মহাশয় সমাজে কি একটা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রায় হাজার লোক একত্রিত হইয়াছিল। তিনি আসিয়া যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেটা কেমন আছে রে"? আমি বলিলাম,

"তিনি ভাল আছেন। পণ্ডিত মহাশয়, গতকল্য শাস্ত্রী মহাশয় সমাজে এমন একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, হাজার হাজার লোক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তাতে আমার কি? যত ব্রহ্মদত্তি ও ভূত একত্র হইয়া ওটাকে মাটি করিল। ওটা যেমন গাধা"! আরও বলিতে লাগিলেন— "আমি আজ কোথায় ঐ জমীদার ব্যাটাদের বাটীর সম্মুখ দিয়া ফেটিং চড়িয়া যাইব, না সেটা আজ অধঃপাতে গেল"। অপত্য-স্নেহ কি মধুর! কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে তিনি পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেটা কাল কি বক্তৃতা করিয়াছিল?" আমি তাঁহাকে সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়া বলিলাম, "দেখুন, আপনার সন্তান আজ হাজার লোকের প্রাণ মন উপাসনা ও বক্তৃতা দ্বারা মোহিত করিয়া দিতেছেন, আপনার মত ভাগ্যবান্ পুরুষ ক'টা আছে?" তখন তিনি স্থিরভাবে বলিলেন, "আমি বুঝি সব, জানি সব, কিন্তু প্রাণ বোঝে না"।

আমাদের শাস্ত্রী মহাশয় যেমন গল্প করিতে ভাল বাসিতেন, তাহার পিতাও ততোধিক গল্পে পটু লোক ছিলেন। একদিন রবি-বার আমার বাটীতে আসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, সেটা কেমন আছে এবং কোথায় থাকে?" আমি বলিলাম, "তিনি এখন ভাল আছেন, ভবানীপুরে উমাচরণ দাসের বাটীতে থাকেন"। তিনি বলিলেন, "সে আবার কে?" আমি বলিলাম, "তিনি পোষ্ট আফিসে হাজার টাকা মাহিনার চাকরী করেন, জাতিতে রজক"। অমনি তিনি মুখটী বিষণ্ণ করিয়া বলিলেন, "ওঃ, সেটাকে আবার ধোপায় পেলে!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ধোপায় পাওয়া কি?" তিনি

বলিলেন, "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি"। আর একটী কথা বলিলেন, "স্বভাব যায় না মলে, আর এল্লোৎ যায় না ধুলে"। আমি বলিলাম ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন, "কয়লা কি ময়লা ছোড় যায়, যব্ আগ্ করে প্রবেশ"। আরও বলিলাম, "আমাদের শাস্ত্রে দেখা যায় অনেক নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তি সাধনা ও তপস্যা দ্বারা ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন"। তিনি বলিলেন, "পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি না থাকিলে তা হয় না"। তখন তিনি বলিলেন, "তুই একটা ধোপার গল্প শুন্‌বি? তবে শোন্।" পাঠক পাঠিকা গল্পটী বড় দীর্ঘ, কেবল আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য লিখিলাম।

গোদাবরী নদীর ধারে চেলাটক্ নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে এক ধোপা বাস করিত। তাহার মদ্রি ও ভদ্রি নামক দুইটী গাধা ছিল। সে প্রতিদিন তাহার একটী ছোট ছেলেকে লইয়া নদীতে কাপড় কাচিতে আসিত। সেই নদীর ধারে একটী অধ্যাপকের টোল ছিল। সেখানে অনেক ছাত্র ব্যাকরণ, দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, ও পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিত। ধোপা যখন শুস্ শুস্ শব্দ করিয়া কাপড় কাচিতে কাচিতে ক্লান্ত হইত, তখন তাহার ছোট ছেলেটীকে তামাক খাইবার জন্য টোলে আগুন আনিতে পাঠাইত। এই প্রকারে সে তিন চার বার টোল হইতে আগুন আনিত এবং ছাত্রদিগের পাঠাভ্যাস শ্রবণ করিত। ধোপার ছেলেটী বড় বুদ্ধিমান্, মেধাবী ও স্মৃতিধর ছিল। সে কিছুদিন টোলে যাওয়া আসা করিতে করিতে ছাত্রদিগের পঠিত শ্লোক সব কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল। পরিশেষে ছেলেটী অধ্যাপকের নিকট পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, অধ্যাপক ক্রোধান্বিত হইয়া, "ব্যাটা

ধোপা, সংস্কৃত শিক্ষা করিবি” বলিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ছেলেটী নাছোড় বান্দা, অধ্যাপক অগত্যা তাহাকে পৃথক্ স্থানে বসিতে আসন প্রদান করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্প-দিনের মধ্যে ছেলেটা মহা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়া উঠিল এবং মনে মনে চিন্তা করিল, “এ রাজ্যে থাকিলে সকলে আমাকে ধোপা বলিবে ; আমি যে এত কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিলাম, তাহার পুরস্কার কি হইবে ?” সুতরাং এ রাজ্য পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করিল। পরিশেষে এক গাছি উপবীত ধারণ করিয়া, অন্য এক অপরিচিত রাজ্যে অধ্যাপকের বেশে সেই রাজ্যের রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইল। সভাস্থ সকলে তাহাকে সসম্ভ্রমে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। সেই সময় রাজ-সভায় একটী বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইতেছিল। এমন সময়ে রাজা সভাপণ্ডিতকে বলিলেন, “এই নবাগত অধ্যাপক মহাশয় এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিন।” তাহাতে রজকপুত্র নানা শাস্ত্র হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া সেই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিলেন। রাজা তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া নবাগত অধ্যাপককে খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহার থাকিবার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অধ্যাপক বেশ সুশ্রী ছিল, তাহাকে প্রথমে সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিলেন, তৎপরে তাহার বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, পারিষদ্‌বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, রাজকুমারীর সহিত তাহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দিলেন। রজকপুত্র রাজ-জামাতা হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনাতিবাহিত করিতে লাগিল। এমন সময়ে রাজা একটী যজ্ঞের আয়োজন করিয়া ভারতের

বড় বড় অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে নানা স্থান হইতে পণ্ডিতেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সঙ্গে, রজকপুত্র যাহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিল, তিনিও আসিলেন। রজকপুত্র তাহার গুরুকে দেখিয়া বড়ই ভীত হইয়া পড়িল এবং তাহার গুরু, ছাত্রকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এখানে কেন আসিয়াছিস্?" রজকপুত্র থতমত খাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া, পরে সমস্ত ঘটনা বর্ণনাপূর্ব্বক তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। আরও বলিল, "যদি আমার কোন কথা রাজাকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে রাজা আমার শিরশ্ছেদ করিবেন।" ঘটনাক্রমে সেই পণ্ডিতের থাকিবার স্থান রাজকন্যার বাটীতে স্থির হইল এবং রাজা কন্যা ও জামাতার উপর তাঁহার সেবার ভার অর্পণ করিলেন। রাজকন্যা প্রতি দিন বিষন্ন ও মলিন বদনে সেই পণ্ডিতের সেবা করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক সেই রাজকন্যার মুখ দেখিয়া তাহার কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকন্যা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে, তাঁহার স্বামীর ব্যবহারের কথা অধ্যাপককে বলিলেন। তখন অধ্যাপক রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী তোমার উপর কি অত্যাচার করে"? রাজকন্যা বলিলেন, "আমাকে সর্ব্বদা প্রহার করে এবং নানা প্রকার কুৎসিত ভাষায় গালি দেয়"। তখন অধ্যাপক রাজকন্যাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে একটী মন্ত্র শিখাইয়া দিতেছি, যখন তোমার স্বামী তোমাকে গালি দিবে বা মারিতে উদ্যত হইবে, তখন এই মন্ত্রটী তাহার সম্মুখে উচ্চারণ করিবে। তাহা হইলে দেখিবে যে,

আর কখন তোমাকে মারিবে না বা গালি দিবে না।" তখন রাজকন্যা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, অধ্যাপকের নিকট মন্ত্রটী অভ্যাস করিতে লাগিলেন। মন্ত্রটী এই—

স্মর চেলাটক গ্রামং, স্মর গোদাবরীতীরং,
স্মর মদ্রীঞ্চ ভদ্রীঞ্চ, স্মরঃ বাসঃ শুশুঃ শুশুঃ।

এই মন্ত্রটী রাজকন্যাকে শিক্ষা দিয়া অধ্যাপক সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। রজকপুত্র যখনই রাজকন্যাকে গালি দিতে বা প্রহার করিতে উদ্যত হইত, রাজকন্যা তখনই দূর হইতে এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতেন। যেমন জোঁকের মুখে লবনসংযুক্ত হইলে তাহার আর কোন শক্তি থাকে না, ঠিক সেই প্রকার রাজজামাতার অবস্থা হইল।

এই গল্পটী বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ধোপার ছেলে এত রাজ-ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়াও নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারিল না।" তাই আমি বলি যে, "স্বভাব যায় না মলে, আর এল্লোৎ যায় না ধুলে।" শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতার অনেক গল্প আছে। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতার এ কথা অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নহে।

শ্রদ্ধেয় আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সাধনা দ্বারা নিজকে ব্রাহ্ম-সমাজের সেবায় কি প্রকার একাগ্র চিত্তে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের শেষ সময়ে লিখিত একটী অপ্রকাশিত অমূল্য কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

সংসার-সরসীজলে আমি যেন পানা,
মূল নাহি, বাঁধা নাহি,
সর্ব্বদা স্বাধীন রহি,

যথা ইচ্ছা ভেসে যাই, নাহিক ঠিকানা।
প্রভুর যে দিন ইচ্ছা, লবে মোরে তুলে ;
বাধা নাই, নাহি টান,
ছিড়িতে হবে না প্রাণ ;
তাঁরি আছি, তাঁরি রব, এ কূলে ও কূলে।

সাধু ভক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত।

জন্ম—৩রা পৌষ, ১২৪৭ সাল। ইং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৪০ সাল।

স্বর্গারোহণ—৪ঠা আষাঢ়, ১৩১৪ সাল। ইং ১৯শে জুন, ১৯০৭।

আমাদের শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ভক্ত উমেশচন্দ্রের স্মৃতি-প্রস্তর ফলকে খোদিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত পদ্যটি রচনা করিয়াছিলেন—

জন্ম হ'তে সাধু ছিলে, সুশীল সজ্জন ;
সদাশয়, সদাচারী, সত্যপরায়ণ।
শত্রু মিত্রে সমভাব, উদার বিনীত,
পরহিতে রত, ধর্ম্মে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।

কিরূপে ভুলিবে তোমা, তব বন্ধু জনে—
স্মৃতিতে রহেছ মাখা, জাগিতেছ মনে !
যাঁর পদে মতি রাখি, জীবন কাটালে,
দেবলোকে, তাঁর পদে, আছ পরকালে।

আজ ১৪ বৎসর অতীত হইতে চলিল, অদ্যাবধি তাঁহার পুত্র-কন্যা বা ব্রাহ্মসমাজের কোন সদাশয় ব্যক্তি সাধু উমেশচন্দ্রের জীবনচরিত প্রকাশ করিলেন না। এ প্রকার গভীর ব্রহ্ম-নিষ্ঠ উপাসকের জীবনচরিত লেখা আমার সাধ্যাতীত। ব্রাহ্মসমাজে ভক্ত উমেশচন্দ্রের মত একত্র ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সমন্বিত সাধুপুরুষ আর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না আমি জানি না। তবে তাঁহার জীবনের কতিপয় অলৌকিক ধর্ম্ম ও কর্ম্মময় ঘটনা, যাহা আমি সেই সাধুপুরুষের নিকট শুনিয়াছি এবং স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিতেছি।

আমার ১৫।১৬ বৎসর বয়সের সময় ভক্ত উমেশচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহার স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত আমি ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। তিনি ভবানীপুর লণ্ডন মিসনারী স্কুল হইতে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথমে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তী হন এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েন; কিন্তু চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, ভবিষ্যতে অন্ধ হইবার আশঙ্কায় কলেজ পরিত্যাগ করিয়া আইন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। (উমেশচন্দ্র বাল্যকাল হইতে নিরামিষাশী ছিলেন) কিছু দিন আইন শিক্ষা করিয়াও ইহাতে নানা প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা আছে দেখিয়া, ইহাও পরিত্যাগ করিলেন। পরে শিক্ষকতা কার্য্যে নিজকে নিয়োযিত করিয়া প্রথমে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী দক্ষিণ বড়ুড় স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া, পরে তিনি তাঁহার বন্ধু কালীকৃষ্ণ দত্ত (ইনি আদি সমাজের ব্রাহ্ম ছিলেন) মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে, তাঁহার নিবধই দত্তপুকুর মধ্য বাঙ্গলা-ইংরাজি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত

হইলেন ; এবং সেখানে কয়েক বৎসর শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে এফ্ এ পরীক্ষা দেন, এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হন। এই সময় শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুল সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ দক্ষিণ হরিনাভি গ্রামে একটী ইংরাজী-সংস্কৃত উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বোধ হয়, তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে উমেশচন্দ্রের জ্ঞান, শিক্ষা ও বহুদর্শিতার কথা অবগত হইয়া, তাঁহাকে ঐ স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। সেখানে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করিতে করিতে বি এ, পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন এবং হরিনাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। পরে তিনি মনোবিজ্ঞানে এম্, এ, দিবার জন্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আর পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। এই সময় একটী ঘটনা ঘটে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুল ও মাতামহী ভক্ত উমেশচন্দ্রের স্বাভাবিক চরিত্র প্রভাবে এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে নিজের বাটীতে থাকিবার ও আহারাদি করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। প্রেম জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু ; ইহার নিকট কোন প্রকার কৃত্রিম ভেদবুদ্ধি দাঁড়াতে পারে না। প্রায় ৫০।৬০ বৎসরের কথা। আমি ভক্ত উমেশচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছি, এক সময়ে উমেশচন্দ্র পাঁচড়া ও জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় দুই তিন মাসকাল শয্যাশায়ী হইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতামহী ভক্তকে এত ভালবাসিতেন যে, সেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকন্যা, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, দিবারাত্রি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। সেই সহৃদয়া দয়াশীলা ব্রাহ্মণকন্যা স্বহস্তে ভক্তের

মল-মূত্র ও পুঁজ-রক্ত পরিষ্কার করিয়া দিতেন এবং রাত্রিতে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতেন। প্রেমময় ভগবানের লীলা যখন মানবহৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তখন আর তাহাতে ভ্রান্ত জাত্যাভিমান থাকিতে পারে না।

ভক্ত উমেশচন্দ্র ইংরাজি, বাঙ্গলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত অপেক্ষাকৃত অল্প জানিতেন বলিয়া, (আমি দেখিয়াছি) হরিনাভি স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট স্কুলের ছুটীর পর সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি মুগ্ধবোধ, কুমার; রঘুবংশ, ভট্টি প্রভৃতি কঠিন পুস্তকগুলি অতি অল্পদিনের মধ্যে অধ্যয়ন করিয়া শেষ করিয়া ফেলিলেন। কৈলাস পণ্ডিত মহাশয় একদিন আমাদিগকে ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে বলিলেন, "আমি এত ছাত্র পড়াইয়াছি, কিন্তু উমেশবাবুর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাসম্পন্ন ছাত্র কখন দেখি নাই।" যখন তিনি কোন্নগর স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন সেখানকার শিক্ষিত লোকেরা বলিয়াছিলেন যে, উমেশ বাবু যে প্রকার ভালমানুষ, এখানকার দুর্দ্দান্ত বদ্‌মায়েস ছেলেদিগকে শাসন করিতে পারিবেন না। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, সেই সকল দুষ্টবুদ্ধি ছাত্রেরা অতি অল্পদিনের মধ্যে এমন বশীভূত হইল যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহ থাকিতে চাহিত না। তাঁহার শিক্ষা ও ছাত্র বশীভূত করিবার শক্তি অন্যরকম ছিল, যাহা সাধারণ শিক্ষকদিগের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল ছাত্রই তাঁহাকে ভয় ও সম্মানের চক্ষে দর্শন করিত। হেয়ার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্‌মাষ্টার গিরিশচন্দ্র দেবকে এক সময় উমেশচন্দ্র

সম্বন্ধে বলিতে শুনিয়াছি, "আমরা গভর্ণমেণ্টকে ঠকাইয়া হেড্মাষ্টারী করি, একটু অঙ্ক কসাইয়া এত টাকা উপার্জ্জন করি, কিন্তু প্রকৃত হেড্মাষ্টার উমেশ বাবু। কারণ, তিনি সকল বিদ্যায় পণ্ডিত"। আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখ হইতে শুনিয়াছি যে, শ্রদ্ধেয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ঠিক উমেশ বাবুর মত ছাত্র বশীভূত করিবার শক্তি ছিল। এইরূপে সাধু উমেশচন্দ্র অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজের চেষ্টা ও যত্নে লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া, অবশেষে সিটী কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলের আদরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

•তাঁহার স্বভাব—সাধু উমেশচন্দ্র শান্ত, ধীর ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি সাধনা দ্বারা নিজ জিহ্বাকে এমন সংযত করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে আবশ্যক কথা ভিন্ন বাজে কথা কহিতে কখন শুনিতাম না। তিনি লেখাপড়ার কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি সময়কে অমূল্য জ্ঞান করিতেন। লোকের যেমন ক্ষুধা পায়, বাল্যকালে তাঁহার সেই প্রকার লেখাপড়া পাইত। আমি স্বর্গগত কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম, "উমেশের শৈশবকালে তাহার মাতা যখন তাহাকে আহারের জন্য ডাকিতেন, তখন উমেশ মাতাকে উত্তর দিত, 'ও মা, এখন আমার লেখাপড়া পেয়েছে, আমি এখন যাইতে পারিব না'।" তিনি অতি বাল্যকাল হইতে, সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, গ্রামের বালকদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার ছাত্রশাসন-প্রণালী বড় আশ্চর্য্য ছিল। কখন কোন ছাত্রকে মারা, দাঁড়া করিয়া দেওয়া, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কটু বা দুর্ব্বাক্য বলা, তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কি আশ্চর্য্য তাঁহার

শিক্ষা-প্রণালী! তিনি প্রেমদ্বারা সকলকে শাসন করিতেন। আমি ৫৫ বৎসর তাঁহার চরণাশ্রয়ে থাকিয়া, কখন তাঁহাকে রাগ বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে দেখি নাই। বিলাসিতা কখন তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। চিরজীবন তিনি একই ভাবে কাটাইয়াছেন। তাঁহার একটী ক্যান্‌ভাসের ব্যাগ্‌ থাকিত; তাহার ভিতর কাগজ, কলম ও দোয়াত থাকিত। যেখানে যাইতেন ঐ ব্যাগ্‌টী ও একটী ছাতি সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিত। তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের উপর কি প্রকার সহৃদয়তা দেখাইতেন, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত লিখিয়া সকলকে জানাইতেছি। প্রত্যেক স্কুলে ভালমন্দ ছাত্র আছে। তিনি স্কুলের সমস্ত ছাত্রের স্বভাব প্রকৃতি ভাল করিয়া প্রথমে বুঝিয়া লইয়া, তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তিনি স্কুলের অবকাশ সময়ে প্রতিদিন একটী না একটী ক্লাশে নিজে পড়াইতেন। যে সকল উচ্চ ক্লাশের ছাত্র একেবারে পড়াশুনা করিত না দেখিতেন, ৪টার পর তাহাদিগকে কাছে ডাকিয়া পড়াইয়া দিতেন। এইরূপে উমেশচন্দ্র কত অনাবিষ্ট ও দুর্দ্দান্ত ছাত্র সকলকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া দিয়াছেন! তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা পরের মঙ্গলের জন্য কাঁদিত। দোষীকে সৎপথে আনয়ন করা তাঁহার চরিত্রের একটী মহৎ গুণ ছিল। তিনি ছাত্রদিগের উপর কি প্রকার ব্যবহার করিতেন, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত লিখিতেছি। যদিও ঘটনা দুইটী হাস্যোদ্দীপক, তত্রাচ উমেশচন্দ্রের মহত্ত্ব ও সহৃদয়তা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ভক্ত উমেশচন্দ্র অল্পবয়স্ক বালকদিগের শিক্ষার জন্য হরিনাভি ইংরাজি স্কুলের সংলগ্ন একটী বাঙ্গালা পাঠশালা খুলিয়াছিলেন। তাহাতে প্রায় দেড়শত

দুঃখীর সন্তান সামান্য বেতন দিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিত। একটী অবিবাহিত গুরুমহাশয়কে ছেলেদিগকে শুভঙ্করী অঙ্ক শিক্ষা দিবার জন্য রাখিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়ের মনে একটা ধারণা ছিল যে, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র কন্যা সকলে জীবিত আছে। গুরুমহাশয় তাঁহার স্ত্রীর কথা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। আমি তখন প্রথমে ভক্তের নিকট লেখাপড়া শিক্ষার জন্য হিন্দুসমাজ হইতে আসিয়াছি। সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ হিত অহিত, কিছুই জ্ঞান ছিল না। কোন প্রকারে সহপাঠীদিগের সঙ্গে মিশিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকিতাম। একদিন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম যে, গুরু-মহাশয়ের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া খাইতে হইবে; ঠিক সেই দিন গুরুমহাশয় মাহিনা পাইয়াছেন। আমরা যাইয়া বলিলাম, "গুরুমহাশয়, কল্য সন্ধ্যার সময় আমরা যখন অমুক স্থান দিয়া বেড়াইয়া আসিতেছিলাম, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইল; আপনার স্ত্রীর আজ পাচ সাত দিন জ্বর হইয়াছে, কিছু পথ্য কিনিয়া পাঠান দরকার হইয়াছে।" গুরুমহাশয় শুনিয়া একেবারে পাগলের মত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "জ্বর ত বেশী হয় নাই? বাঁচ্‌বে তো? যাহা হউক, একটি টাকা দিতেছি, এখনই তোমরা পথ্য কিছু কিনিয়া দিয়া আইস।" আমরা টাকাটী পাইয়া আনন্দে রাজপুরের বাজারে গিয়া মিঠাই কিনিয়া সকলে আহার করিলাম। এই প্রকার ঔষধ ও পথ্যের নাম করিয়া অনেক টাকা আদায় করিয়া খাইতাম। এক দিন ঘটনাক্রমে উমেশচন্দ্র আমাদের ঠকান-বিদ্যা জানিতে পারিয়া সকলকে ডাকিলেন। আমরা ভয়ে কম্পিত হইয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র,

হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমরা নাকি গুরু মহাশয়ের স্ত্রীর পীড়া হইয়াছে বলিয়া টাকা আদায় করিয়া আহার কর? তোমাদের বড় অন্যায় হইয়াছে। এ প্রকার আর করিও না।"

আর একটী ঘটনা—হরিনাভি স্কুলবাটীর একটী গৃহে, গৃহস্বামীর একটী ধাতু নির্ম্মিত সিংহবাহিনী ঠাকুর ছিল। প্রতিদিন তাহার পূজার্চ্চনা ও ভোগ হইত। আমরা কয়েকটী সহপাঠী একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে, প্রতিদিন রাত্রে ঠাকুরের ভোগ হইতে কিছু খাইতে হইবে। আমরা সেই ব্রাহ্মণকে বলিলাম, "আমাদিগকে প্রতিদিন তোমার ভোগের লুচি সন্দেশ হইতে কিছু দিতে হইবে, নচেৎ আমরা তাহা ছুঁইয়া দিব।" তাহাতে সে বলিল, "আমরা গরীব, রাত্রিতে ত আমাদের রান্না হয় না, এই ঠাকুরের ভোগ খাইয়াই রাত্রি কাটাই, তোমাদিগকে দুই চারি খানি করিয়া দিব।" আমরা ঠিক সময়ে রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম। দুই চারি খানিতে আমাদের কিছুই হয় না দেখিয়া, লোভপরবশ হইয়া একদিন তাহাকে ছুঁইয়া দিলাম। অমনি সে রাগ করিয়া ভোগ রাস্তায় ফেলিয়া দিল,—আমরা সকলে কুড়াইয়া লইয়া আহার করিলাম। পরে সেই ব্রাহ্মণ ভক্ত উমেশচন্দ্রকে আমাদের দুর্ব্যবহারের কথা সমস্ত জানাইলে, তিনি আমাদিগকে ডাকিলেন। আমরা ভয়ে ভয়ে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে, ভক্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে কে ইহার লুচি সন্দেশ খাইয়াছ, বল"। আমি সকলের নাম করিলাম; তিনি সকলকে বলিলেন, "তোমরা আজ কি অন্যায় কাজ করিয়াছ! তোমরা কি জান না ইহারা গরীব? রাত্রিতে ইহারা অনাহারে থাকিবে?

ভবিষ্যতে এ প্রকারে পরের দ্রব্য লোভ করিয়া খাইও না।” তৎপরে তিনি নিজে ঐ গরীব ব্রাহ্মণকে রাত্রির আহারের জন্য আট আনা প্রদান করিলেন। উমেশচন্দ্রের আজ্ঞা প্রতি-পালনের জন্য আমরা আর সেই গরীব ব্রাহ্মণের আহার স্পর্শ করিতাম না।

আর একটী ঘটনা।

এই রূপে আমাদের আহারের পথ বন্ধ হইয়া গেল দেখিয়া, সহপাঠী কয়েকটী একত্র হইয়া পরামর্শ করিল যে, কি উপায়ে আহার হইবে? আমাদের মধ্যে কাশীনাথ ঘোষ নামক একটী সহপাঠী বলিল, “আমি ঠিক সন্ধ্যার পর বহুরূপী সাজিয়া পয়সা আদায় করিব, তাহাতে আমাদের আহার চলিবে।” একদিন সন্ধ্যার পর কাশীনাথ এমন সন্ন্যাসী সাজিয়া ভক্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল যে, ভক্ত তাহাকে দেখিয়া কোন প্রকারে চিনিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে আট আনা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন; আমাদের আহারের যোগাড় হইল। এইরূপ কাশীনাথ কিছুদিন করিতে করিতে ভক্ত একদিন জানিতে পারিলেন যে, কাশীনাথ বহুরূপী সাজিয়া সকল স্থানে পয়সা আদায় করে এবং তদ্দারা সকলে আহার করে। তিনি কাশীনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি লেখাপড়া ছাড়িয়া এ প্রকার করিলে পরীক্ষা দিতে পারিবে না। কখন এ কাজ করিও না।” কাশীনাথ সে কার্য্য পরিত্যাগ করিল। সেই কাশীনাথ এম, বি, পাশ করিয়া কলিকাতায় একটী বড় ডাক্তার হইয়াছিল। এখন পাঠক পাঠিকা ভক্ত উমেশচন্দ্র

আমাদের এত দোষ ও অপরাধ দেখিয়া আমাদিগকে, বিশেষতঃ আমাকে, যদি তাড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে আমার কি দুর্গতি হইত? কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। ভগবান্ সেই ভক্তচরিত্র যে শুধু ক্ষমা ও দয়া দ্বারা গঠন করিয়াছিলেন! তিনি আমাকে তাড়াইতে পারেন? তিনি শিক্ষক, আমি ছাত্র। কত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি বলিয়া কি একদিনের জন্যও আমাকে প্রেম ভিন্ন অপ্রেম দ্বারা শাসন করিয়াছেন! ভক্তচরিত্রের কি মহত্ত্ব!

তাঁহার দান।

সাধু উমেশচন্দ্র যখন হরিনাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তখন তিনি একশত টাকা বেতন পাইতেন। এই একশত টাকার মধ্যে প্রায় ৭০৲।৭৫৲ দুঃখী ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন এবং সেখানকার নিরাশ্রয় ও অসহায় দুঃখী লোক ও পরিবার-দিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করিতেন। বাকী টাকা তাঁহার নিজের জন্য ব্যয় করিতেন। তিনি মাহিনা পাইলে সমস্ত টাকা আমার কাছে রাখিয়া দিতেন এবং যাহাকে যাহা দিতে হইবে, প্রত্যেক মাসে তাহার একটী ফর্দ্দ করিয়া দিতেন; আমি সেই অনুসারে সকলকে টাকা দিয়া দিতাম। ইহা ভিন্ন আগন্তুক দরিদ্রের সংখ্যা এত বাড়িয়া যাইত যে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট খরচের টাকা পর্য্যন্ত নিঃশেষ হইয়া যাইত। তিনি প্রতি মাসে কোন প্রকারে নিজের খরচ চালাইয়া লইতেন। তিনি কখন কোন দুঃখীকে রিক্ত হস্তে ফিরাইতেন না।

তাঁহার পরোপকারিতা।

ভগবান্ যে মানবহৃদয় পরের জন্য এমন করিয়া গঠন করিয়া থাকেন, এই ধারণা, তখন আমি ভাল করিয়া উপলব্ধি

করিতে পারিতাম না। সাধু উমেশচন্দ্রের সঙ্গ লাভ করিয়া, তাহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিয়াছিলাম।

সাধু উমেশচন্দ্র প্রতিদিন সকাল বৈকাল দুঃখী লোকদিগের অভাব মোচনের জন্য প্রায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গে একটী হোমিওপ্যাথিক বাক্স থাকিত। কাহারও বাটীতে পীড়া হইলে তাহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেন। দুঃখী লোকদিগের পথ্যের খরচ নিজে হইতে দিতেন। হরিনাভিতে গোলোক যোগী নামক (ইহাকে সকলে গোল্কা বলিয়া ডাকিত) একটী দুঃখী বাস করিত। সে গামছা বুনিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিত। গোলোক ভক্ত উমেশচন্দ্রকে ছাড়িয়া থাকিত না। আবার ভক্তও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতেন না। ভক্ত গোলোককে পাইলে যেন গোলোকে বাস করিতেছেন মনে করিতেন। যেমন প্রাতঃকাল উপস্থিত হইত, গোলোক আসিয়া উপস্থিত। উমেশচন্দ্র নরসেবার জন্য পাড়ায় বাহির হইলেন, গোলোকও হোমিওপ্যাথিক বাক্সটী লইয়া ভক্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; ৯টা বাজিলে ভক্ত যেমন ফিরিলেন, গোলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোলোক কিছু পাইবার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছে, ভক্তকে গিয়া বলিলাম, পয়সা দিবার আজ্ঞা দিলেন, গোলোক পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। গোলোকের জন্য ভক্তের অনেক টাকা খরচ হইতে লাগিল। আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম যে, গোলোকের জন্য এমন একটা বন্দোবস্ত করুন যাহাতে সে নিজে উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিছু টাকার গামছা কিনিয়া বিক্রয় করিবার জন্য দেওয়া হইল, তাহা সবই আহার করিয়া ফেলিল; পরে

আবার সূতা কিনিয়া গামছা বুনিয়া বিক্রয় করিবার জন্য দেওয়া হইল, তাহাও সমস্ত খাইয়া ফেলিল। কিন্তু গোলোকের এ প্রকার ব্যবহারে উমেশচন্দ্র একদিনের জন্যও বিরক্ত হন নাই। তৎপরে ভক্ত উমেশচন্দ্র যখন কোন ঘটনাসূত্রে হরিনাভি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে আসিলাম। (উমেশ বাবুর হরিনাভি পরিত্যাগের কথা পরে সকলে জানিতে পারিবেন।)

উমেশচন্দ্রের কর্ম্ম পরিত্যাগের কথা যখন হরিনাভি ও তন্নিকট-বর্ত্তী গ্রাম সকলে প্রচারিত হইল, তখন অনাথ দুঃখী ও নিরাশ্রয় নরনারী যাহারা তাঁহার সাহায্যে প্রতিপালিত হইত, তাহাদের ভিতর একটা হাহাকার ও ক্রন্দনের ধ্বনি উত্থিত হইয়া, সকলের প্রাণ মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন যে, ভক্ত উমেশচন্দ্রের প্রাণ পরের দুঃখে কি প্রকার ক্রন্দন করিত। ভক্ত উমেশচন্দ্র ওখান হইতে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় কিছুদিন অবস্থিতির পর, কোন্নগর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া, কয়েক বৎসর সেখানে কার্য্য করিলেন। তৎপরে শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, তাঁহার নিজের স্কুলের অবস্থা শোচনীয় মনে করিয়া, তাঁহাকে উহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া পুনরায় হরিনাভিতে আনয়ন করিলেন। আমি যেমন তাঁহার সাহায্যে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলাম, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথ দেবও তাঁহার সাহায্যে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিল। আমি কলিকাতা থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতে লাগিলাম, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভক্তের সঙ্গে হরিনাভিতে গমন করিল।

সেই চিরদুঃখী গোলোক আবার তাঁহার আশ্রয় পাইয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল। আমি কনিষ্ঠ ভ্রাতার মুখে শুনিয়াছি যে, ভক্ত উমেশচন্দ্রের হরিনাভিতে অবস্থিতি কালে ভক্তের অতি আদরের গোলোক বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। ভক্ত উমেশচন্দ্র গোলোকের চিকিৎসার জন্য হোমিওপ্যাথিক বাক্স ও রাধানাথকে সঙ্গে লইয়া গোলোকের পর্ণ কুটীরে গিয়া চিকিৎসা ও সেবা করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন তাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গোলোকের মলমূত্র পরিষ্কার ও নিয়মিত ঔষধ সেবন করাইয়াও গোলোককে রক্ষা করিতে পারিলেন না: গোলোক নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া গোলোকধামে চলিয়া গেল। একদিকে নিরাশ্রয় পরিবারদিগের হাহাকার ও ক্রন্দনধ্বনি, অপরদিকে শব শায়িত; এখন উপায় কি? আবার যোগীর শব দাহ করিতে নাই। গোলোকের আত্মীয় স্বজন কেহ ছিল না এবং পাড়ার ভদ্রলোকেরা যোগীর শব স্পর্শ করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সাহসী হইল না। ভক্ত উমেশচন্দ্র কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি ও রাধানাথ উভয়ে শব স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে লইয়া গেলেন। সেখানে মৃত্তিকা স্বহস্তে খনন করিয়া গোলোকের নশ্বর-দেহ প্রথিত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

ভক্ত উমেশচন্দ্র চিরজীবন নর-সেবায় তাঁহার জীবনকে নিয়োযিত করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার কর্ম্মময় জীবন।

সাধু উমেশচন্দ্র বাল্যকাল হইতে নিজ জীবনতন্ত্রীকে এমন এক সমঞ্জস সুরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে,

কি বার্দ্ধক্যে, সমভাবে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম রাজ্যে, তাঁহার সেই জীবন তন্ত্রী যখন বাজিত, তখন সকলে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি ধর্ম্মসাধনাদ্বারা যেমন সিদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কর্ম্মকে ঠিক সেই প্রকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অতীতের পুণ্যস্মৃতি এখন স্মরণ হইলে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। তিনি যে কার্য্য ধরিতেন বা হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা সম্পন্ন না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। বড় আশ্চর্য্য যে, সর্ব্বদা তিনি নবোদ্যমে ও নবোৎসাহে কার্য্য করিতেন। নিরাশা ও নিরুৎসাহ কখন তাঁহাতে দেখি নাই। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের দুই একটী ঘটনা লিখিয়া সকলকে জানাইতেছি।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে, এই কুসংস্কারাপন্ন বঙ্গদেশে নারীজাতির শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া, সাধু উমেশচন্দ্র ও তাঁহার কয়েকটি বন্ধু একত্র হইয়া "বামাবোধিনী পত্রিকা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অর্থাভাবে সময় সময় তাহা প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইত। উমেশচন্দ্র নিজে বন্ধুদিগের সাহায্যে পত্রিকাখানি প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু সেই সময় স্ত্রীশিক্ষার উপর দেশীয় লোকের যে প্রকার আস্থা ছিল, তাহাতে পত্রিকার আয় হইতে বাৎসরিক খরচ কুলাইত না। এই জন্য কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়," এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সেই সময়ে দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে "বামাবোধিনীর" সাহায্যার্থ কিছু টাকা আদায়ের সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিলেন। রাজীবলোচন রায় মহারাণীর দেওয়ান ছিলেন। আমাদের মাননীয় রামশঙ্কর সেন মহাশয় রাণাঘাটের

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে রাজীবলোচন বাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল। রামশঙ্কর বাবুর নিকট হইতে একখানি সুপারিশপত্র আনিবার জন্য, ভক্ত উমেশচন্দ্র একদিন হঠাৎ রাত্রি ৮টার সময় আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "তুমি শীঘ্র আহারাদি করিয়া লও, রাত্রি ৯॥০টার গাড়ীতে রাণাঘাট যাইতে হইবে।" আমি এবং তিনি ঠিক সময়ে সেয়ালদাহ ষ্টেষণে উপস্থিত হইয়া, টিকিট কিনিবার জন্য বুকিং আফিসে গিয়া রাণাঘাটের টিকিট চাহিলাম; তখন টিকিটবিক্রেতা বলিল যে, এ গাড়ী রাণাঘাটে দাঁড়াইবে না, তাহার নিম্ন ষ্টেষণ চাক্‌দাহে থামিবে। আমি গিয়া ভক্তকে বলিলাম; তিনি বলিলেন, "তুমি চাক্‌দাহের টিকিট ক্রয় করিয়া আন। চাক্‌দাহ হইতে দুই চারি ক্রোশ পথ রাত্রে হাঁটিয়া যাইলেই হইবে। যখন বাহির হইয়াছি, যাইতেই হইবে।" তখন অগত্যা গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চাক্‌দাহের টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে গিয়া উভয়ে বসিলাম। গাড়ী রাত্রি ১১॥০টার সময় চাক্‌দাহে গিয়া পৌঁছিলে; আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া, যে গেট্ দিয়া সকল লোক বাহির হইতেছিল, সেই গেট দিয়া বাহির হইয়া একটী লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাণাঘাট যাইবার রাস্তা কোন দিকে? সে লোকটি বলিল, "আপনারা এত অন্ধকার রাত্রে রাণাঘাটে হাঁটিয়া যাইবেন কেমন করিয়া? তবে আপনারা এই দিকে যাইলে, রেলের ধারে ধারে যে রাস্তা আছে, তাহাতে যাইতে পারিবেন।" অপরিচিত স্থান, গভীর অন্ধকার, তাহাতে আবার গ্রীষ্মকাল! কিছু দূরে যাইতে যাইতে বামদিকে বৃহৎ তালবৃক্ষে আবৃত একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাইলাম এবং তাহাতে একটি লোক আহারাদি করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছে,

এই শব্দ শুনিতে পাইয়া, সেখানে একটু অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে সেই লোকটি আমাদের সম্মুখীন হইলে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও হে বাপু? আমরা রাণাঘাটে যাইব কোন পথ দিয়া, তুমি দেখাইয়া দিতে পার?" সে বলিল, "এ ধার দিয়া উত্তর দিকে ৫।৬ ক্রোশ পথ যাইলে সেখানে যাইতে পারিবে।" তাহার কথানুসারে সেই গভীর রাত্রে ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে একটী গৃহস্থের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পরে সেখানে ডাকাডাকি করিতে করিতে, একটী মুখরা স্ত্রীলোক গৃহ হইতে বাহির হইয়া নানাপ্রকার কুৎসিত ভাষায় আমাদিগকে গালি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এত রাত্রে এখানে কেন আসিয়াছ?" আমি বলিলাম, "বাছা, রাণাঘাটের রাস্তাটা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পার? আর একটা লোক দিতে পার, যে আমাদিগকে রাণাঘাটে পৌছাইয়া দিয়া আসিতে পারে?" সেই স্ত্রীলোক ইহাতে আরও ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, "এ দুটা হতভাগা মিন্সে এত রাত্রে কোথা হইতে আসিল, ইহারা চোর নাকি? ঐদিকে চলিয়া যাও।" ভক্ত উমেশচন্দ্র এই প্রকার দুর্ব্ব্যবহারে হাসিতে লাগিলেন এবং আমরা সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অপর দিকে যাইতে লাগিলাম। আমি ভক্তকে বলিলাম, "এ স্থানটী ভাল নহে, আমার মনে হইতেছে এ বেশ্যাপাড়া।" যাহা হউক, একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটী লোক দাবায় (মেটে ঘরের বারাণ্ডায়) বসিয়া তামাক খাইতেছে। আমরা তাহার কাছে গিয়া বলিলাম, "বাপু, আমরা এই রাত্রে বড় বিপদে পড়িয়াছি, তুমি এ পাড়ার চৌকীদার কিম্বা অন্য একটা লোক দিতে পার, যে আমাদিগকে রাণাঘাটের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের

বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে পারে?" সেই লোকটী মাজিষ্ট্রেট্‌-সাহেবের নাম শুনিয়া, সভয়ে ঘরের ভিতর হইতে একটী মাছুর আনিয়া সাদরে বসিতে বলিল। তখন রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়াছে। সেই লোকটী বলিল, "চৌকীদার এখন পাড়ায় বাহির হইয়া গিয়াছে, তবে আপনারা বসুন, আমি একটা লোক আনিয়া দিতেছি, সে আপনাদিগকে রাণাঘাটে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।" এই প্রকার কথা হইতেছে, এমন সময় একটী ২৪।২৫ বৎসরের সুন্দরী স্ত্রীলোক সলজ্জে গৃহ হইতে বাহির হইয়া, আমাদের দুরবস্থার কথা শুনিয়া, বসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—"আপনারা এই গভীর অন্ধকার রাত্রে এ প্রকার অসমসাহসিক কার্য্য কেন করিয়াছেন? দুই তিন দিন হইল এই রাস্তায় একটা পথিকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে খুন করিয়াছে। কল্য রাণাঘাটের মাজিষ্ট্রেট্‌ আসিয়া তদারক করিয়া গিয়াছেন। আপনারা বসুন, রাত্রি প্রভাত হইলে এখান হইতে যাইবেন।" আমরা তখন বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলাম; বারাণ্ডার উপর বসিয়া ক্লান্তিনিবারণ করিতে করিতে, আমি তাহাকে বলিলাম, "বাছা! আমাদের কাছে তিনটী মাত্র টাকা আছে এবং একটী রূপার ঘড়ি আছে। এই সামান্য অর্থলোভে কি আমাদিগকে মারিবে?" স্ত্রীলোকটী বলিল, "চোর ডাকাত অগ্রে মারিয়া, পরে টাকা আছে কিনা অনুসন্ধান করে।" আমি সেই স্ত্রীলোকটীর মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে ভয়ে অবসন্ন হইয়া সেখানে শয়ন করিলাম। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া, সেই স্ত্রীলোকটীকে বলিলাম, "বাছা! বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি, আমাকে একটু জল দিতে পার?"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "আমি ভদ্র বংশের মেয়ে, এখন বৈষ্ণব হইয়াছি; আপনারা কি আমার জলপান করিবেন?" আমি বলিলাম, "জলপান করিতে দোষ কি? এখন প্রাণ বাঁচাই, তুমি জল দাও।" জলপান করিয়া প্রাণ শীতল করিলাম। তৎপরে আমাদের জন্য একজন পথ প্রদর্শক আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা প্রায় রাত্রি ২টার সময় রওয়ানা হইয়া অতি প্রত্যূষে রামশঙ্কর বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রামশঙ্কর বাবু অনুরোধ পত্র দিলেন এবং আমরা প্রাতের গাড়ীতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। সেই অনুরোধ বশতঃ মহারাণী 'বামাবোধিনী'র সাহায্যার্থে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন। আসিবার সময় রামশঙ্কর বাবু আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন, "এ প্রকার অসমসাহসিক কাৰ্য্য আর করিবেন না"। এক্ষণে পাঠক পাঠিকা আমাদের উভয়ের পার্থক্য একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। আমি ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় ভয়ে বিহ্বল হইলাম, আর সাধু উমেশচন্দ্র—একদিকে একটা কুলটা রমণীর তর্জ্জন গর্জ্জন ও কুৎসিত ব্যবহার এবং অপরদিকে আর একটী কুলটা রমণীর সদ্ব্যবহার,—এই উভয়েই কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, অচল ও অটল থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া গৃহে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন!

সাধু উমেশচন্দ্রের আর একটী অক্ষয় কীর্ত্তি।

সাধু উমেশচন্দ্র লোকচক্ষুর অগোচরে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার এই ৯১ বৎসরের মধ্যে এমন একটী লোক এই সমাজে জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি উমেশচন্দ্রের

ন্যায় কল্যাণকর্ম্মের কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ, যখন নূতনাকারে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিয়া প্রকাশ করিবেন, তখন উমেশচন্দ্রের এই অক্ষয় কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে তাহাতে লিখিত থাকিবে, এই আশায়ই আমি ইহা প্রকাশ করিলাম। প্রায় ১৮।১৯ বৎসর পূর্ব্বে উমেশচন্দ্রের এবং বঙ্গদেশের শিক্ষিত যুবকদিগের প্রাণে উচ্চ বিজ্ঞানানুমোদিত দেশীয় শিল্পকলা শিক্ষা দিবার একটী সঙ্কল্প জাগ্রত হইয়াছিল। আমি দেখিয়াছিলাম, সেই সঙ্কল্প তিনি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাধ্য মতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প কখন বৃথা হইতে দেখি নাই। তিনি কোন কার্য্য মানবীয় শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া করিতেন না বলিয়া, তিনি সকল কার্য্যে জয়লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পোষিত সঙ্কল্প শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, তাঁহার কলেজের প্রধান বিজ্ঞানাচার্য্য রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, শ্রীমান্ সত্যসুন্দর দেবকে জাপানে পাঠাইয়া শিল্প শিক্ষা দিবার মনস্থ করিলেন এবং অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া সত্যসুন্দরের বিদেশে শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মাসিক বৃত্তি সংগ্রহ করিলেন। তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না। যুবক শিক্ষার্থী সত্যসুন্দরের জীবনকে ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, মহর্ষিদেব কর্তৃক তাহার দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। [মহর্ষিদেব দীক্ষান্তে যোগযুক্ত হইয়া যে সন্তানকে ভবিষ্যৎ বাণী দ্বারা পূত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মসন্তান এক্ষণকার সুপরিচিত শিল্পী সত্যসুন্দর দেব।] এইরূপে সাধু উমেশচন্দ্র সমস্ত আয়োজন করিয়া ২১ বৎসর

বয়স্ক যুবককে ব্রহ্মমন্ত্রে পূত করিয়া জাপানে শিল্প শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তিনি সত্যসুন্দরের জাপানে রওয়ানা হইবার দিনে উপাসনা করিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, "ঈশ্বরের অগ্নিময় নামে অগ্নিময় ভাটার মত, আমরা তোমাকে ছাড়িলাম। যেখানে যাইবে, সেইখানেই বিজয়ী হইবে। আত্মার উত্তাপ যদি কিছু কম বোধ কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের নামের মধ্যে এবং ব্রহ্ম-কৃপার মধ্যে যে স্বর্গীয় অগ্নি আছে, তাহা স্মরণ করিলে, তাহাতে সকল বাধা বিঘ্ন ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে।" সত্য-সুন্দর আড়াই বৎসর কাল বিদেশে শিক্ষা করিয়া, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল এবং সাদা মাটী হইতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ৪৫নং ট্যাংরা রোডে, কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস্ নামে, নূতনাকারে একটী কারখানা স্থাপন করিল। সাধু উমেশচন্দ্র ব্রহ্মনামে পূত করিয়া এই কারখানার ভিত্তি-বীজ প্রোথিত করিয়া দিলেন। মানবের কীর্ত্তি কখন বিলোপ হয় না। আজ উমেশচন্দ্র স্বর্গে, কিন্তু তাঁহার প্রোথিত বীজ আজ কি প্রকার ফুল ফলে সুশোভিত বৃক্ষরূপী হইয়া ভারতের এক অপূর্ব্ব দর্শনীয় স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, ভক্ত উমেশচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবনের মহতী কীর্ত্তি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।

সাধু উমেশচন্দ্রের সাধন ভজন।

আমি এতদিন সেই সাধু পুরুষের সঙ্গ লাভ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। কিন্তু দুই একটী ঘটনা ছাড়া তিনি যে

কি প্রকার সাধনা দ্বারা তাঁহার জীবনকে এত উচ্চ স্থানে তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা এখনও পর্য্যন্ত কোন প্রকারে চিন্তা করিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। শ্রদ্ধেয় কালীনাথ দত্ত মহাশয় বলিতেন, "উমেশ মাতৃ গর্ভ হইতে সাধনা করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।" বাস্তবিক তিনি একজন যোগী মহাপুরুষ ছিলেন। তাই আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় অনেক চিন্তা করিয়া এই কবিতাটী লিখিয়াছিলেন, "জন্ম হ'তে সাধু তুমি সুশীল সজ্জন" ইত্যাদি। যখন হরিনাভি স্কুলে পাঠাভ্যাসের জন্য আমি এবং আমার একটী সহপাঠী তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিতাম, তখন তাঁহার সাধনা সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছিলাম। আমরা সকলে এক ঘরে শয়ন করিতাম। তিনি রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেন, তৎপরে তাঁহাকে ব্রহ্মোপাসনায় একাসনে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে দেখিতাম। আবার কোন কোন দিন রাত্রি ২টার পর তাঁহাকে গৃহে থাকিতে দেখিতাম না। আমি এবং আমার সহপাঠী মনে করিতাম যে, তিনি কোন কারণে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু এই প্রকার কয়েক দিন দেখিয়া আমাদের মনে একটা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল যে, এত রাত্রে তিনি কোথায় গমন করেন? আমরা পরামর্শ করিলাম যে, ইহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা নানা প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিয়া দেখিলাম যে, তিনি একটী নিকটবর্ত্তী শ্মশানে, সেই গভীর রাত্রে, চতুর্দ্দিকে শৃগাল কুকুর পরিবেষ্টিত স্থানে, নির্ভয়ে একাকী বৃক্ষতলে বসিয়া, ব্রহ্মযোগে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়া একাসনে বসিয়া আছেন। ব্রাহ্ম-সমাজের অনেকেই জানিতেন যে, আমাদের

১১ই মাঘের উৎসবে সাধু উমেশচন্দ্র, ভোর ৪টা হইতে রাত্রিতে যে পর্য্যন্ত না উৎসব শেষ হয় সে পর্য্যন্ত, একাসনে বসিয়া ব্রহ্মানন্দ-সুধা পান করিতেন। তিনি নিত্য ব্রহ্মসহবাস লাভ করিতেন বলিয়া সর্ব্বদা ভূমানন্দরসে মগ্ন থাকিতেন। তিনি সাধনা দ্বারা জীবনকে এমন গঠন করিয়াছিলেন যে, সংসারের রোগ, শোক, বিপদ আপদের ভিতর তাঁহাকে অচল ও অটল হইয়া থাকিতে দেখিতাম। পরিশেষে আরও দেখিয়াছিলাম যে, ব্রহ্মকে সর্ব্বদা হৃদয়স্থ করিবার জন্য প্রাণায়াম যোগ পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভাব।

চরিত্রই মানবের অমূল্য রত্ন; কিন্তু এই চরিত্র সকলের সমানভাবে বিকশিত হয় না। কাহার বা আংশিকভাবে, কাহার বা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। যে মানব নিজ সাধনা দ্বারা রজঃ ও তমঃগুণকে বশীভূত করিয়া সত্বগুণে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন, সেই মানব জাতিনির্ব্বিশেষে পূজিত হইয়া থাকেন। তখন তিনি আর নিজ সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিতে চাহেন না। সেই সত্বগুণাশ্রিত সাধুপুরুষের মুখে দু'টা ভগবানের কথা শুনিবার জন্য লোকে ব্যাকুল হইয়া উঠে। সাধু উমেশচন্দ্র সেই জন্য সকল জাতির নিকট পূজিত হইয়া গিয়াছেন।

একদা কোন স্থানে একটী সমৃদ্ধিশালিনী হিন্দু বধূ, স্বামী-পুত্র-কন্যাসমাবৃতা হইয়া আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা ছিলেন। তাঁহার স্বামী, তাঁহার মুমূর্ষু আত্মার কল্যাণের জন্য হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, সেই সতী নারীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন।

তাঁহার মৃত্যুর তিন চারি দিন পূর্ব্বে, তিনি তাঁহার এক পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এখনই গিয়া অমুককে সংবাদ দাও যে, তিনি যেন উমেশবাবুকে সঙ্গে লইয়া আমার শেষ জীবনে আমাকে ব্রহ্ম-নাম শুনাইয়া যান"। মাতার আজ্ঞানুসারে সেই সন্তানটী আমাকে আসিয়া বলিল, "আমাদের জননী হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়ায় সান্ত্বনালাভ করিতে না পারায়, তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, আপনি উমেশবাবুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে যেন ব্রহ্মনাম শুনাইয়া আসেন।" এই কথা আমি ভক্ত উমেশচন্দ্রকে জানাইলে, তিনি আনন্দের সহিত একতন্ত্রী হস্তে লইয়া সেই মুমূর্ষু সাধ্বী নারীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সঙ্গীত ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। সেই নারী উমেশচন্দ্রের উপাসনা ও প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া নয়নাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে এই রূপে তিন দিন ব্রহ্মনাম শুনিতে শুনিতে সেই সতী নারী দুই হস্ত যোড় করিয়া উমেশচন্দ্রের সম্মুখে পরলোকে চলিয়া গেলেন। কি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না। এই প্রকার অনেক ঘটনা উমেশচন্দ্রের জীবনে দেখিয়াছিলাম।

হরিনাভির লোমহর্ষণ ব্যাপার।

আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে চলিল, হরিনাভি ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া, সাধু উমেশচন্দ্র ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। তাহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিবে বলিয়া, আমি ইহা সবিস্তার লিখিতেছি; কারণ, ইহা আমার চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়াছিল।

সাধু উমেশচন্দ্র হরিনাভি স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াই স্থানীয় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের কয়েকটী লোককে লইয়া একটী ব্রাহ্ম-সমাজ গঠন করিলেন। তৎপরে নববিধান বিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ দের বাটীতে একটু জমি লইয়া একটী চালাঘর নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে স্থায়ীভাবে উপাসনার বন্দোবস্ত করিলেন। এই প্রকারে কিছু-দিন সমাজের কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করিলেন। তখন হরিনাভি প্রভৃতি গ্রামসকলের ভদ্রলোকগণের মনে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের মনে, মহা ভীতির সঞ্চার হইল এবং যে সকল ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা সমাজে আসিয়া উপাসনা করিত, তাহাদের উপর তাহাদের অভিভাবকগণ নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল। দেশের সমস্ত লোক একত্র হইয়া পরামর্শ করিল যে, উমেশবাবু শিবনাথকে পরামর্শ দিয়া উপবীত পরিত্যাগ করাইয়াছেন, সুতরাং কোন ব্রাহ্ম স্কুলের শিক্ষক থাকিতে পারিবে না। এই প্রস্তাব করিয়া সেক্রেটারী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট এক দরখাস্ত করিল। উমেশচন্দ্র এই সংবাদ অগ্রে জানিতে পারিয়া একখানি পদত্যাগ-পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যখন উমেশবাবুকে ডাকিয়া সকলের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, তখন উমেশবাবু পদত্যাগ-পত্র তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অতি স্নেহের পাত্র উমেশচন্দ্রকে ছাড়িতে তিনি চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। উমেশচন্দ্র স্কুল পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি প্রতি সপ্তাহে সমাজে গিয়া উপাসনা করিয়া আসিতেন। তাহা দেখিয়া, দেশের লোক একত্র হইয়া, জমীদার নবীনচন্দ্র ঘোষের সহিত পরামর্শ করিয়া,

যাহাতে উমেশবাবু এখানে আসিয়া উপাসনা করিতে না পারেন, তাহার বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। কালীপূজার কিছু অগ্রে যখন উমেশচন্দ্র সকল উপাসককে লইয়া সমাজগৃহে উপাসনা করিতেছিলেন, তখন দেশের প্রায় ১৫০।২০০ শত লোক একত্র হইয়া সমাজঘরটী ঘেরোয়া করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল; এবং আলো নিবাইয়া দিয়া, সকল উপাসককে একে একে পাঁজাকোলা করিয়া, সমাজের সম্মুখে যে একটী ধঞ্চেক্ষেত্র ছিল, তাহাতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে অনেকেই রক্তাক্ত হইয়া নির্য্যাতনের ভয়ে কে কোথায় পলায়ন করিল, কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারা গেল না। উপাসকদিগের বিনামা পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া নির্য্যাতনকারীরা পলায়ন করিল। কিন্তু বড় আশ্চর্য্য উমেশচন্দ্রের গাত্রে কেহ হস্তস্পর্শ করিল না। আমাদের শ্রদ্ধেয় হরনাথ বসু মহাশয় সঙ্গে ছিলেন। এখানে সকলে জানিয়া রাখিবেন যে, পূর্ব্ব হইতে জমীদারবাবু পুলিসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র বরাবর পুলিসে গিয়া দেখিলেন যে, একটী কন্‌ষ্টেবল্ ভিন্ন কেহ নাই। পরে উমেশচন্দ্র কন্‌ষ্টেবেলের নিকট হইতে পুলিসের ডায়ারীখানি লইয়া, তাহাতে সমস্ত লিখিয়া রাখিয়া, বরাবর আলীপুর মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বাটীতে প্রাতঃকালে আসিয়া তাঁহাকে সকল জানাইলেন। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব উমেশ-চন্দ্রের মুখ হইতে অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "আমি তাহাদের ভাল করিয়া শাসন করিয়া দিব, যাহারা তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের নাম আমাকে লিখিয়া দাও, আর পর সপ্তাহে কোন্ দিন তোমাদের উপাসনার দিন, আমাকে বল, আমি সেই দিন লোক পাঠাইয়া

তোমাদের উপর যাহাতে আর অত্যাচার করিতে না পারে, তাঁহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব। তুমি এ সকল লোকদিগের নামে শীঘ্র নালিশ রুজু করিয়া দাও।"

উমেশচন্দ্র বরাবর সেখান হইতে কলুটোলায় কেশবচন্দ্র সেনের নিকট আসিয়া হরিনাভির অত্যাচারের কথা তাঁহাকে সকল জ্ঞাপন করিলেন। অনেক দিনের কথা হইলেও আমার এখন বেশ স্মরণ আছে। ব্রহ্মানন্দ উমেশবাবুকে বলিলেন, "তাহারা আমাদের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিলে তাহাদের কঠিন শাস্তি হইবে। যাহা হউক, তোমাকে কয়েকটী কথা বলিতেছি, তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিও না। আগামী সপ্তাহে এখান হইতে কয়েকটী প্রচারক ও অন্যান্য ব্রাহ্মদিগকে লইয়া, সেখানে গিয়া খুব জম্‌কাইয়া উপাসনা ও কীর্ত্তন করিবে; এবং আর একটী কথা, কোন প্রকার প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য নালিশ করিও না। তবে তাহাদিগকে কিছু শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে এ প্রকার ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ না করে।" উমেশচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের এই মধুময় আধ্যাত্মিক উপদেশ শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে, পর সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রাতের রেলে উমেশচন্দ্র, প্রচারক কান্তিবাবু, গৌরবাবু, ত্রৈলোক্যবাবু, মহেন্দ্রবাবু এবং হরনাথ বসু প্রভৃতি কয়েক জন একত্র হইয়া হরিনাভিতে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সমাজ গৃহে দেশের লোক শালগ্রাম এবং কালী প্রতিমা আনয়ন করিয়া ঢাক ঢোল

বাজাইয়া পূজা করিতেছে। ইহা দেখিয়া উমেশবাবু কেদারনাথ দের খুড়া শ্যামাচরণ দেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার জমার উপর সমাজ-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, আপনি কেন আমাদের সমাজের ভিতর কালী ঠাকুর ও শালগ্রাম শিলা আনিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "হরিনাভি হইতে ব্রাহ্মসমাজ তুলিয়া দিবার জন্য দেশের লোক এই প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়াছে।" সাধু কেদারনাথ সেই সময়ে লাহোরে চাকরী করিতেন। পরে উমেশচন্দ্র বৃদ্ধ শ্যামবাবুকে বলিলেন, "আপনি কি জানেন না যে, আমাদের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহাতে আপনার কি কঠিন শাস্তি হইবে? আপনি বলিয়া দিন কোন্ কোন্ লোক এই প্রকার কার্য্য করিয়াছে" তখন শ্যামবাবু ভীত হইয়া কতকগুলি লোকের নাম বলিয়া দিলেন। উমেশবাবু সেইগুলি লিখিয়া লইলেন। পরে তিনি প্রচারকগণকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার প্যারিচরণ দের বাটীতে গিয়া উপাসনা ও আহারাদি করিলেন। প্রচারকগণ ১॥• টার গাড়ীতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কেবল আমি, উমেশবাবু ও হরনাথ বসু সন্ধ্যার গাড়ীতে আসিব বলিয়া সেখানে রহিলাম। উমেশবাবু বলিলেন, "এস, আমরা সমাজের দিকে যাই।" আমি বলিলাম, "আবার কি মার খাইতে যাইব?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "ভয় কি, এস না?" আমরা সমাজের দিকে আসিতে আসিতে দেখিলাম যে, পাড়ার লোক সকল ছুটাছুটি করিয়া কে কোথায় পলায়ন করিতেছে। আমরা ইহা দেখিয়া বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাড়াতাড়ি সমাজের দিকে আসিয়া দেখিলাম যে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রেরিত পুলিস ইন্‌স্পেক্টার সমাজ-

হইতে কালী ঠাকুর বাহির করিতেছেন এবং সেই ধঞ্চে বনে নিক্ষেপ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। পাড়ায় লোক নাই, রাস্তায় জন মানব নাই, ঢাকী ঢাক্ ফেলিয়া, ঢোলী ঢোল ফেলিয়া, কে কোথায় পলায়ন করিয়াছে, তাহার নির্দেশ নাই। আমরা গিয়া পৌঁছিলে, সেই পুলীস বাবুটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমেশবাবু কাহার নাম?" আমি তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, "ইঁহার নাম উমেশবাবু।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "মাজিষ্ট্রেট সাহেব পাঠাইয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞানুসারে আপনাকে এই গৃহে উপাসনা করিতে হইবে। একটু অপেক্ষা করুন, এই ঠাকুরটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিই।" পরে তিনি দেখিলেন যে, একটী শালগ্রাম শীলা সেখানে রহিয়াছে। ভূস্বামী শ্যাম বাবুকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ঠাকুর কাহার?" তিনি বলিলেন, "আমার ঠাকুর ঘর মেরামত হইতেছে, সেই জন্য আম এখানে রাখিয়াছি।" তখন বাবুটী শ্যামবাবুকে বলিলেন, "আপনার ঠাকুর ঘর কি প্রকার মেরামত হইতেছে দেখিব।" এই বলিয়া, শ্যামবাবুর সঙ্গে তিনি গমন করিয়া দেখিলেন যে, যেমন ঘর তেমনি রহিয়াছে, মেরামত কিছুই হয় নাই। তিনি যত প্রকার ঘটনা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছেন, সমস্তই লিখিয়া লইতেছেন। শালগ্রাম সমাজ হইতে স্থানান্তরিত হইলে, উমেশবাবু আমাদিগকে লইয়া সেই গৃহে উপাসনা করিলেন। তৎপরে ইন্‌স্পেক্টার বাবু বলিলেন, "আপনি প্রতি. বুধবার এখানে আসিয়া উপাসনা করিবেন। যদি কোন লোক আপনাদিগের উপর অত্যাচার করে, প্রথমে থানায় সংবাদ দিয়া, পরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইবেন। এবং আপনারা

যে, এখানে আজ উপাসনা করিলেন, ইহা আমাকে একটু লিখিয়া দিন, সাহেবের এই আজ্ঞা।” উমেশবাবু তাঁহাকে লিখিয়া দিয়া সমাজে তালা বন্ধ করিলেন, এবং আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

তৎপরে উমেশচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের নিকট গমন করিয়া, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে জানাইলেন। ব্রহ্মানন্দ সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া নালিশ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। উমেশ বাবু আলিপুর কোর্টে নালিশ রুজু করিয়া দিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সকল অত্যাচারীর উপর ওয়ারেণ্ট বাহির করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। উমেশ বাবু ইহা শুনিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিলেন যে, ওয়ারেণ্টের পরিবর্ত্তে সমন বাহির করিবার আজ্ঞা দিলে ভাল হয়। তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উমেশ বাবুকে বলিলেন “are you a saint?” “তুমি কি ঋষি?” তাহাতে উমেশ বাবু বলিলেন, “আমরা উহাদিগকে কোন কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না, তবে উহারা একটু শাসিত হয়, এই আমাদের ইচ্ছা।” তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্টের পরিবর্ত্তে সমনের আজ্ঞা দিলেন। যখন সকলকে সমন ধরান হইল, তখন হরিনাভির ভিতর একটা হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হইল। উমেশ বাবু বুধবার যখন হরিনাভিতে উপাসনা করিতে গেলেন, তখন সকলে আসিয়া উমেশ বাবুকে ধরিল এবং বলিল, “আপনি কি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না?” তাহাতে উমেশ বাবু বলিলেন, “মোকদ্দমা যখন রুজু হইয়াছে; তখন কোর্টে গিয়া যাহা ভাল হয় করা যাইবে। এখন কিছু বলিতে পারি না।” এইরূপে যত মোকদ্দমার দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আসামীগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া ক্রমাগত

কলিকাতায় আমাকে ও উমেশ বাবুকে উত্যক্ত করিতে লাগিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া জমীদার নবীনবাবু উমেশবাবুকে বলিলেন, "আপনি ক্ষমা করিয়া মোকদ্দমাটী উঠাইয়া লউন। আপনি যাহা চাহিবেন, আমরা তাহা দিব।" তখন উমেশবাবু তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। নবীনবাবু বলিলেন, "পাড়ার ভিতর হইতে সমাজটী তুলিয়া লউন, আর যত দিন না আপনি নূতন সমাজ নির্ম্মাণ করিবেন ততদিন স্কুলের সম্মুখে যে আমার বাগানবাটী আছে, তাহাতে আপনি সমাজ করিতে পারিবেন। আর শ্যামবাবু বড় রাস্তার ধারে এক খণ্ড জমী দিতে প্রস্তুত আছেন, সেখানে আপনি নূতন সমাজ নির্ম্মাণ করুন।" এই প্রস্তাব উমেশবাবু ব্রহ্মানন্দকে জানাইলে, তিনি আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। মোকদ্দমার দিন আসামীগণ ক্ষমা প্রার্থনা ও এই সকল প্রস্তাব কোর্টে দাখিল করিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহাতে সম্মতি দান করিলেন। উমেশচন্দ্র মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলেন। তৎপরে মহর্ষিদেবের সাহায্যে হরিনাভিতে পাকা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ নির্ম্মিত হইল। ধর্ম্মের জয় সকল সময়েই হইয়া থাকে।

ভক্ত উমেশচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে অনেক ঘটনা আমি লিখিয়া রাখিয়াছি; যদি কোন সদাশয় ব্যক্তি তাঁহার জীবন-চরিত প্রকাশ করেন, আমাকে জানাইলে আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিব। আমি কেবল এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সমুদয় প্রকাশ করিলাম না। পরিশেষে বক্তব্য এই, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, এই হরিনাভির লোমহর্ষণ ব্যাপারে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের চরিত্রের মহত্ত্ব, অতুলনীয় ধৈর্য্য ও ক্ষমাশীলতা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

পরিশিষ্ট।

অতীত ও বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ।

"গড়া বড় কঠিন, ভাঙ্গা অতি সহজ।" 'ব্রহ্ম কৃপাহিকেবলম্' এই বিশ্বাস এবং অতীতের সাধু মহাত্মাদিগের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া আমি অতীতের ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মসমাজের বংশধরদিগের' অবগতির জন্য, প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। ইহা সকলের মনঃপূত হইবে কি না, তাহা আমি জানি না। তবে এত সাধু ভক্তদিগের আশীর্ব্বাদ কি কখন বিফল হইতে পারে? আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

সে কালে মফঃস্বলেও অনেক সাধু ভক্ত ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের জীবনের ইতিহাস কিছু লিখিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ জ্ঞানে লিখিতে সাহসী হইলাম না, তজ্জন্য সাধারণ পাঠক পাঠিকা আমাকে ক্ষমা করিবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির যখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা কি প্রকার ছিল, শ্রদ্ধেয় শিবনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই সময়ে ব্রহ্মমন্দিরকে সম্বোধন করিয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহার শেষাংশ পাঠ করিলে পাঠক পাঠিকা তাহা সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া, নিম্নে সেটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"আজি মোরা গুটি কত,
পথের ভিখারী মত,

হে মন্দির, তব কোলে রহিয়াছি পড়িয়া,
কিন্তু কালে হেন দশা যাবে যাবে চলিয়া।"

কোন একটা জিনিষের গঠন কার্য্য করিতে হইলে অগ্রে তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গঠন করিতে হয়। পার্থিব রাজ্যের উপকরণ এক প্রকার, আধ্যাত্মিক রাজ্যের অন্য প্রকার। একটী সামান্য গৃহই হউক, আর বৃহৎ অট্টালিকাই হউক, উহা নির্ম্মাণ করিতে হইলে অগ্রে ইট্, চূন, সুরকী, কাষ্ঠ প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিতে হয়; তাহাও আবার একদিনে হয় না, কার্য্যটী সময়সাপেক্ষ। এই ব্রাহ্মসমাজরূপ বৃহৎ অট্টালিকাটি একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের ভক্তচরিত্রের সৌন্দর্য্যের প্রভাব, যখন ভারতের চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া, মানবাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তখনই নরনারী, অভূতপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, আত্মীয়স্বজন ও নিজ নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যেমন যোগ দিতে লাগিল, অমনি একটু একটু করিয়া এই অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হইতে লাগিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অতীতের প্রচারক ও অপ্রচারক ভক্তেরা কি উপকরণে নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিয়া সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন? এখানে একটী বড় উপাদেয় সংস্কৃত শ্লোক আমার মনে পড়িল, তাহা এই—

অক্রোধো বৈরাগ্যং জিতেন্দ্রিয়ত্বং,
ক্ষমা দয়া শীলং জনপ্রিয়ত্বং,
নির্লোভো দানং ভয়শোকহানিং
ধর্ম্মস্য চিহ্নং দশ লক্ষণানি।

অক্রোধ, বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়সংযম, ক্ষমা, দয়া, সচ্চরিত্র, জন-প্রিয়তা, নির্লোভ, দান এবং শোক ও ভয়হীনতা, এই দশবিধ গুণ ধর্ম্মের প্রধান চিহ্ন। আমি একাধারে এই সকল ধর্ম্মের লক্ষণ অনেক ভক্তের মধ্যে দেখিয়াছি।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কথা আমার হঠাৎ মনে পড়িল। এক দিবস পূর্ণিমার দিন বৈকালে পরমহংসদেবকে দর্শন করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, কয়েকটী ভক্ত তাঁহাকে ঘেরিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেছেন। আমি গিয়া দেখিলাম যে, ধর্ম্মালাপটা বেশ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। আমি এক পার্শ্বে গিয়া বসিবামাত্র পরমহংসদেব আমাকে দেখিয়া সম্মুখে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া বসিলাম। সেই সময়ে ধর্ম্মালাপটী এই প্রকার চলিতেছিল যে, "মানুষ সাধনা দ্বারা কি প্রকারে ভগবানকে লাভ করে।" তিনি বলিতে লাগিলেন, "তিনটী জিনিস সাধনার মত সাধন করিলে মানব প্রাণে ভগবান্‌কে পাইবার জন্য একটা টান হয়। সেই টানটী প্রকৃত হইলে ভগবান্ আবার তাঁহাকে টানিয়া লন, তখন উভয়ের টানাটানিতে ভক্ত চুপ হইয়া যায়; তখন আর ভক্তের ভন্‌ভনানি কন্‌কনানি ও ভকভকানী শব্দ থাকে না।" আমি বলিলাম, "ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আপনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।" তিনি বলিলেন, "তোদের সমাজে এ প্রকার ভক্ত অনেক আছেন, তুই জানিস্ না?" তৎপরে তিনি উপস্থিত সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। "কেমন জানিস্—

সতীর, পতির প্রতি যেমন টান।

মাতার, সন্তানের প্রতি যেমন টান।

বিষয়ীর, বিষয়ের প্রতি যেমন টান।

এই তিনটী টানের মত মানব ব্যাকুল হইয়া সাধনা করিলে ভগবান্‌কে আত্মস্থ করিয়া চুপ হইয়া যায়।" আমি বলিলাম, "ভন্‌-ভনানী, কলকলানী ও ভক্‌ভকানী কি বলিলেন, বুঝাইয়া দিন।" তিনি বলিলেন, "দেখ—

মৌমাছি ফুলের মধু যতক্ষণ না পায়, ততক্ষণ ভন্‌ভন্‌ করিয়া বেড়ায়, যেই মধু পায় অমনি চুপ হইয়া যায়।"

তৈল কড়ায় দিয়া জাল দিলে যতক্ষণ কাঁচা থাকে, ততক্ষণ কলকল করিয়া শব্দ হয়; যেই গাজা মরিয়া পাকিয়া যায় আর শব্দ থাকে না।"

পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা কলসী কাঁকে করিয়া পুকুরে জল আনিতে যায়, কলসীটি যতক্ষণ না পূর্ণ হয়, ততক্ষণ ভক ভক্ করিয়া শব্দ হয়, আর যেই উহা জলে ভরিয়া যায় অমনি শব্দটী বন্ধ হইয়া যায়।

ভক্তের অবস্থা ঠিক এই প্রকার হয়।" তৎপরে আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আমাদের সমাজের ভক্তের কথা কি বলিলেন, তাহা বলুন।" তিনি বলিলেন, "তাও আবার তোকে বলিতে হইবে; তবে বলি শোন্। ঐ দেখ তোদের দেবেন্দ্রনাথ অত ধনৈশ্বর্য্যের ভিতর থাকিয়া পদ্মপত্রের জলের মত নিজকে নির্লিপ্ত রাখিয়া সাধনাদ্বারা ব্রহ্মকে হৃদয়স্থ করিয়া চুপ হইয়া গিয়াছে। ঐ তোদের কেশব, ঐ তোদের বিজয়, ঐ তোদের অঘোর; আর কত নাম করিব? আর তোদের শিবনাথ এখন টানাটানির ভিতর আছে, শীঘ্র চুপ হইয়া যাইবে।" তিনি শিবনাথকে বড়ই ভালবাসিতেন। ভক্ত রামকৃষ্ণের একটা ঐশ্বরিক

শক্তি ছিল যে, লোকের মুখ দেখিলেই সে ভক্ত কি অভক্ত সহজে চিনিতে পারিতেন। তাই তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের ভক্তদিগকে ভালরূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, উপরের কথাগুলি বলিয়া অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এখন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, আপনারা অতীতের ভক্তচরিত্র সমালোচনা করিয়া চিন্তা করুন যে, অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজ ভক্তদিগের কত সাধনার ফল। এই সাধনা সহজ সাধনা নয়, ইহা মুখের বাহ্যিক সাধনা নয়, ইহা শিশুদিগের পুতুল খেলার সাধনা নয়। অগ্রে রজঃ তমঃ গুণকে তপস্যাদ্বারা বশীভূত করিয়া সত্ত্বগুণের অধিকারী হইলে মানব ভগবানে যুক্ত হয়। এই সাধনার ভিতর দিয়া অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজের সাধকগণ নিজ নিজ চরিত্র সংগঠন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, একদিন তাঁহারা সকলকে ব্রাহ্ম-সমাজে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কারণ, চরিত্র মানবের একটী অমূল্য সম্পত্তি। যে হিন্দু-সমাজ এক সময়ে ব্রাহ্মদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার, নির্য্যাতন, ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, সেই হিন্দু-সমাজের শিক্ষিত লোক-দিগের মুখে আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি যে, ব্রাহ্মেরা সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলে না, ব্রাহ্মেরা স্বার্থত্যাগ করিতে পারে, ব্রাহ্মেরা পরের জন্য জীবন দিতে পারে। এখন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, আপনারা অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজের গৌরব কেবল চিন্তা করুন। এখন কেবল অতীতের ভক্ত চরিত্র চিন্তা করিতে হইবে। প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা মনে পড়িল। একদিন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদীতে বসিয়া উপদেশ দিবার সময়, চরিত্র সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতে করিতে এই অমূল্য উদাহরণটী দিয়া-ছিলেন। "মানুষ চরিত্র প্রভাবে অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে।

ইহুদা দেশে সূত্রধর গৃহে অশিক্ষিত যিশু জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্যা প্রভাবে নিজ চরিত্রকে এমন করিয়া সৌন্দর্য্যশালী করিয়াছিলেন যে, ইউরোপের ধনী নির্ধন, বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও কবি প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং ছোট বড় নরনারী সকলে তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে মস্তক অবনত করিয়া পূজার্চ্চনা করিতেছে।” এ কি চরিত্রের প্রভাব! এই চরিত্রের প্রভাবে খৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক, কবীর, চৈতন্য, দেবেন্দ্র, কেশব, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি এক একটী সম্প্রদায় গঠন করিয়া ভারতে এক একটী অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ভক্তচরিত্র বড়ই মধুর, যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রেম ভক্তির হিল্লোল হৃদয়ের অন্তরতর স্থান হইতে উত্থিত হইতে থাকে, আরও ভক্ত চরিত্র বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হয়। পুনরুক্তি দোষ আর তখন মনে থাকে না। এই ভক্ত চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে ভক্ত রজনীকান্ত সেনের একটী মধুময় কীর্ত্তন আসিয়া মনে উদয় হইল। আমার মনে হয়, ভক্ত রজনীকান্ত অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজের সাধকদিগের অন্তরে প্রবেশ করিয়া, এই সুমধুর কীর্ত্তনটি রচনা করিয়াছিলেন। এই কীর্ত্তনটির প্রত্যেক পংক্তি, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক অক্ষর হইতে যেন প্রেমের লহরী উত্থিত হইয়া শুষ্ক হৃদয়কে সরস করিয়া এবং হরিপ্রেমে মাতোয়ারা করিয়া ভগবচ্চরণে লইয়া যাইতেছে। কীর্ত্তনটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

কীর্ত্তন।

ব'য়ে যাক্ হরি-প্রেমের বন্যা শুষ্ক হৃদয়-মাঝে,
ডুবাও রমণী পুত্র কন্যা অভিমান ধন লাজে (ও রে ডুবে যাক্)

(তোমার প্রেমের প্রবল বন্যায়, ওরা ডুবে যা'ক্)
আমি ভেসে যাব, নাথ—(আমি সফল হ'ব)
(তোমার প্রেমের একটানা স্রোতে ভেসে যাব, নাথ)
তোমার পায়ে আপন হারিয়ে সফল হ'ব।

যে প্রেমের স্রোতে, আপনা হারিয়ে, গোরা বলে হরিবোল হে,
সংসার-তেয়াগী, দু'হাত বাড়ায়ে, পাতকীরে দিল কোল হে।

(বলে, হরি বল ভাই) (গোরা বলে, হরি বল ভাই)
(ধন জন মান কিছুই নয়, শুধু হরি বল, ভাই)
(কে টেনেছিল) তারে কে টেনেছিল—
(ঘরে যুবতীর প্রেম ভুলা'য়ে দিয়ে কে টেনেছিল)
(ঘরে স্নেহ-পাগলিনী মা ভুলা'য়ে কে বা টেনেছিল—
আর রইল না হে) (আর ঘরে রইল না হে)।
(কি মধু পেয়ে সে পাগল হ'ল, ঘরে রইল না হে)
(আর ঘরে থাক্‌বে কেন ?) (সকল মধুর সার মধু পেলে
থাক্‌বে কেন ?)

যে প্রেমে প্রহ্লাদ বাচে বিষ পানে, শিলা সহ ভাসে জলে হে;
পোড়ে না অনলে, মরে না পাষাণে, বাঁচে করি-পদতলে হে,
সে কেবল তোমায় ডাকে—অবোধ শিশু তোমায় ডাকে—
কোথায় বিপদ-ভঞ্জন দয়াল বলে, তোমায় ডাকে—
(তারে কে মার্‌তে পারে) (তুমি কোলে করে তারে বসেছিলে—
কে বা মার্‌তে পারে)
(তুমি প্রেম-সুধা দিয়া অমর কর্‌লে—কে মার্‌তে পারে)

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের কথা লিখিবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কেবল ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া প্রাণে একটা গভীর বেদনা অনুভব করিতে হয় বলিয়া, বর্ত্তমান ভক্ত সাধকদিগকে কিছু সবিনয় নিবেদন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। আমি কাহাকে কোন প্রকার আঘাত দিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া লিখিতেছি না; আমি সর্ব্বদা আঘাত পাই বলিয়া লিখিতেছি।

গণিতশাস্ত্র যেমন একটী সংখ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক, যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা, বৃহৎ বৃহৎ অঙ্কপুস্তক সকল প্রস্তুত করিয়া, সাধারণ শিক্ষার পক্ষে মহোপকার সাধন করিয়াছে; সেই প্রকার এক রামমোহন হইতে দেবেন্দ্রনাথ, তৎপরে কেশব-চন্দ্র, রাজনারায়ণ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হইয়া প্রথমে আদি ব্রাহ্মসমাজ সংগঠিত হইল। তৎপরে কেশবচন্দ্র যখন আদি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হইবার পর এত সভ্য সংখ্যা সমাজে যোগ দিতে লাগিলেন যে, তাহা গণনা করিবার জন্য যোগের পরিবর্ত্তে গুণের প্রয়োজন হইল। আবার শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি সাধকগণ যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ তিন ভাগে বিভক্ত হইল। তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ ও গুণ দুই-ই দেখিয়াছিলাম।

বর্ত্তমানে সেই তিনটী ব্রহ্মমন্দির মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই তিনটী ব্রাহ্মসমাজের আত্মত্যাগী ধর্ম্মবীর মহাপুরুষগণ, নিজ নিজ সাধনা দ্বারা উপাসকমণ্ডলীকে আধ্যাত্মিক যোগে যুক্ত করিয়া, একে একে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এখন ব্রাহ্মসমাজ বিয়োগের অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। যোগ গুণ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলই বিয়োগ। অতীতের গুণ যোগ ও বিয়োগ এক প্রকার দেখিয়াছিলাম, আর বর্ত্তমানের অন্য প্রকার দেখিতে পাইতেছি! বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকগণ, আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন যে, কি প্রকার অসার জিনিসের যোগ গুণ ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে! আর কি মহামূল্য জিনিসের বিয়োগ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজে বর্ত্তমানে অতীতের ন্যায় কি আছে? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা দর্শন করিয়া, গভীর চিন্তান্বিত হইয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা, এই তিনটী ব্রহ্মমন্দির একই শক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া, একই মন্ত্রে এবং একই ব্রহ্মের উদ্বোধন, আরাধনা ও প্রার্থনা দ্বারা পূজার্চ্চনা করিতেছে। সেই একেরই তিন এবং তিনের এক। অথচ আমাদের পরস্পরের ভিতর অপ্রেম, অশান্তি, দ্বেষ, হিংসা যেন মুখব্যাদান করিয়া পরস্পরকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমরা এক প্রপিতামহ, এক পিতামহ, এবং এক পিতা হইতে ব্রাহ্মসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমাদের মধ্যে কাহাকেও সপত্নীপুত্র দেখিতে পাই না। তবে কেন আমরা এই সোণার সংসারে

অশান্তি আনয়ন করি? যেখানে প্রেম সেখানে ত গঠন হইবেই হইবে; কারণ, প্রেমের ধর্ম্ম গঠন করা। আর যেখানে অপ্রেম সেখানে ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে; কারণ, অপ্রেমের ধর্ম্ম ভাঙ্গা। ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার অপার করুণায় ও প্রেমে এই ব্রাহ্মসমাজ নূতন বিধানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম! —জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়কে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজে মতের বিভিন্নতা আছে, তাহা জানি; তাই বলিয়া কি আমরা স্ব স্ব মতের গণ্ডির ভিতর চিরদিন অবস্থিতি করিব? মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে পরস্পরে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া একটী স্থানে সম্মিলিত হইতে হইবে। কালস্রোতে আজ পৃথিবীর কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের প্রত্যেক কার্য্য বা ঘটনা ব্রহ্মশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

দাবানলের সামান্য একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, অজ্ঞাতসারে কোথা হইতে আসিয়া, যেমন সমস্ত বনস্থলীর ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ ও লতা গুল্মকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, তেমনি এক সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া, পঞ্চবৎসরব্যাপী যুদ্ধে আজ ইউরোপ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। অনেক বৎসর ধরিয়া ইউরোপের সম্রাট্ ও প্রজা, ধনী ও নির্ধন, বিদ্বান ও মূর্খ প্রভৃতি ভোগবিলাসিতা ও স্বার্থপরতার মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, ভগবচ্ছক্তি হৃদয়ে অনুভব করিতে না পারিয়া, কালস্রোতে আজ কোথায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে! মহা প্রতাপান্বিত রাজশক্তি আজ বিলীন হইয়াছে ও প্রজাশক্তি জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান

সময়ে ইউরোপের সকল দেশের নরনারী, পঞ্চবৎসরব্যাপী যুদ্ধ বিস্মৃত হইয়া, চাতকের ন্যায় পরস্পরে সখ্যতায় আবদ্ধ হইয়া, পুনঃ শান্তি লাভের আশায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই যুদ্ধ পৃথিবীর নরনারীর প্রাণে এক নব আকাঙ্ক্ষা জাগ্রৎ করিয়া দিয়াছে। "চিরদিন কখন সমান না যায়"—পরিবর্ত্তনশীল জগতে কালে কি না পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে!

তাই বলি, বর্ত্তমান সময়ে তিনটী ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রদ্ধেয় প্রচারক, অপ্রচারক, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সকলে, অতীতের যে সকল কারণ বা ঘটনা দ্বারা আদিসমাজ হইতে ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং ভারতবর্ষীয় হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া, পরস্পরের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া, একটী স্থানে ব্রহ্ম-পূজার্চ্চনা এবং মানব-সেবাব্রতাশ্রম স্থাপনের জন্য, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" এই মহামন্ত্র হৃদয়ের বিশ্বাসের সহিত ধারণপূর্ব্বক, ব্রহ্মের নবতর বিধানে সমবেত শক্তিদ্বারা সম্মিলিত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজকে নব অভ্যুত্থানের পথে চালিত করিতে সচেষ্ট হউন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "সেই একেরই তিন এবং তিনেরই সেই এক"। আপনাদের সমবেত শক্তি দ্বারা, একটু ত্যাগ স্বীকার করিয়া, একবার চেষ্টা করিলেই বা ক্ষতি কি? অনেকেই বলিবেন, "এ লোকটার মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়াতে, এ বিকারী রোগীর ন্যায় প্রলাপ বকিতেছে। ভাঙ্গা হাঁড়ি কি কখন জোড়া লাগে?" আমি বলি, "হাঁ, লাগে। এতো মৃত্তিকানির্ম্মিত পার্থিব হাঁড়ি নয়, এ যে অন্তররাজ্যের অদৃশ্য হাঁড়ি!" শত শত ভাঙ্গা হৃদয়, প্রেম ভক্তি ও ত্যাগের আঁটায় জোড়া লাগিতে

দেখিয়াছি। ব্রহ্মনামে অসম্ভব সম্ভব হয়। তাই বলি, এই সুসময়ে সকলে একত্র হইয়া ব্রহ্মপূজার আয়োজন করুন। আমি বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা দর্শন করিয়া নিরাশ বা হতাশ হই নাই, কেবল আঘাত পাইতেছি; বোধ হয়, আমার মত আঘাত অনেকেই পাইতেছেন। অনেক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ডায়েরীতে কি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"এ বিষয়ে আর ভাবিলে কি হইবে? সবলেই হউক আর দুর্ব্বলেই হউক, আত্মোন্নতি সাধনের চেষ্টা এবং ঈশ্বর ও মানবের সেবাব্রত বিরাম হইতে দেওয়া হইবে না। দেহ মনে যে শক্তি থাকিবে, তাহার সমগ্র তাঁহার কাজে দিতে পারিলেও যথেষ্ট। তাহা ত আমরা দিতেছি না। আমাদের শক্তি সাধ্যে যতদূর হয়, তাহা ত হইতেছে না। আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা ত করিতেছি না। "আছে গোরু, না বয় হাল, তার দুঃখ চিরকাল," এই যে লৌকিক একটা কথা আছে, তাহা অনেক পরিমাণে আমাদের ঘটিয়াছে। আমাদের শক্তিসকল সমাজের সেবায় লাগিতেছে না, বৈরাগ্যানল ভাল করিয়া জ্বলিতেছে না, অপ্রেমের প্রবলতানিবন্ধন হৃদয়গুলি একীভূত হইতেছে না।

* * *

"আমাদের মধ্যে এমন কতকগুলি লোকের প্রয়োজন, যাঁহারা আমাদের সকল দলের বন্ধনরজ্জুর সমান হইবেন। তাঁহারা সকল দলের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন, সকল দলের অভিসন্ধি ও কার্য্যের প্রতি

আস্থাবান্ হইবেন; সহিষ্ণুতা উদারতা ও প্রেমের সহিত সকল দলের বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রকৃত উদারতার অভাবে ব্রাহ্মসমাজের অনেক ক্ষতি হইতেছে। .... সমাজের মধ্যে অনুদার, অসহিষ্ণু, সঙ্কীর্ণচেতা লোক, সকল সময়েই থাকিবে; নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে এই সকল লোককে দাবিয়া রাখিতে হইবে।

* * *

"আজ ব্রাহ্মসমাজের নব অভ্যুত্থানের কথা ভাবিতেছি। 'আমরা অসার, তিনি সার', এই সত্য কথা। তাঁহার উপরে আমাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর করিতে হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিক অন্ন পান তিনিই যোগাইবেন। ব্রাহ্মসমাজকে বলীয়ান তিনিই করিবেন। আমরা কেবল প্রার্থনা করিব ও তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব। আমাকে একবার ভাল করিয়া এই প্রেমাগ্নির মধ্যে পড়িয়া যাইতে হইবে। এমন করিয়া পড়িতে হইবে, যাহাতে আমার স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়সুখ-লালসা একেবারে দগ্ধ হইয়া যায়, ও আমার হৃদয় অকৃত্রিম প্রেমে সকল শ্রেণীর মানুষকে আলিঙ্গন করিতে পারে। মানবীয় ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইলে, ইহা হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। সেই সুরের সঙ্গে হৃদয়ের তার মিলাইলে, যে সুর বাজে তাহা স্বর্গীয় সুর, আনন্দের সুর, অপূর্ব্ব প্রেমের সুর। সেই শক্তি আত্মার প্রেরক হইলে, চিন্তা অনন্ত-প্রসারিত জ্ঞানসমুদ্রে সন্তরণ করিতে ভালবাসে, হৃদয় প্রেমবাহু বিস্তার করিয়া জগৎকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হয়, এবং যেখানে মানবের দুঃখ এবং যেখানে মানবের হিতসাধনার্থ

চেষ্টা, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয়; বিবেক জাগ্রত ও সতেজ হইয়া অন্যায়ের প্রতি সিংহনাদ করিতে থাকে; এবং মন সেই পরম সুন্দরের অপার সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিতে থাকে। পতঙ্গ যেমন অনলে আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের নর-নারী, প্রদীপ্ত প্রেমানলে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইবে,—এই চাই। নিরাকার ঈশ্বরকে আকাশে রাখিলে হইবে না, প্রত্যেকের হৃদয়দ্বারে উপস্থিত করিতে হইবে।"

মানব সেবাশ্রম—বর্ত্তমান সময়ে এই তিনটী ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী, আচার্য্য ও সাধারণ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগকে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যগণ আজ ভারতের অসহায়, নিরাশ্রয়, দীনদুঃখী নরনারীর সেবার জন্য কি না করিতেছেন! আর ব্রাহ্মসমাজ কি করিতেছে? বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ, মারিভয়, জলপ্লাবন প্রভৃতি নানাপ্রকার বিপজ্জনক অবস্থার ভিতর পড়িয়া নিঃস্ব নরনারী হাহাকার-ধ্বনিতে সকলের হৃদয়কে বিকম্পিত করিয়া তুলিতেছে। আজ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়া অন্য সমাজ দুইটী নিশ্চিন্ত ও নীরব কেন? আমাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য মহর্ষিদেব দুস্থ নরনারীর দুঃখ নিবারণার্থ কি সাহায্য করেন নাই? আমাদের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কি এ পথ সকলকে দেখাইয়া দিয়া যান নাই? অতীতের বেহালার মারিভয়ের কথা একবার সকলে স্মরণ করুন। যিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্পৃষ্ট একটী স্থায়ী সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া, নিজে মান অপমান গ্রাহ্য না করিয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, জাতি নির্ব্বিশেষে কত অসহায় নরনারীর মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সেই স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় পরোপকারী গুরুচরণ

মহালানবীশের কথা একবার সকলে স্মরণ করুন। সাধু উমেশ-চন্দ্রের জীবনচরিত পাঠ করিয়া সকলে দেখিবেন, তিনি কি প্রকারে তাঁহার জীবনে পরোপকার-ব্রত সাধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় কান্তিচন্দ্রের কথা, একবার সকলে স্মরণ করুন। বেশী দিনের কথা নয়, যখন বৰ্দ্ধমান জেলার পল্লীগ্রামের নরনারী-সকল হঠাৎ দামোদর নদের জলপ্লাবনে পুত্র কন্যাগণকে লইয়া মহা বিপদে পতিত হইয়া অসহায় অবস্থায় হাহাকার করিতেছিল, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বৰ্ত্তমান আচার্য্য শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়, সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার স্বাভাবিক দয়াপ্রবণতাগুণে আকৃষ্ট হইয়া, প্রথম পথ প্রদর্শক হইয়া, ভিক্ষা দ্বারা সেই জলপ্লাবিত নরনারীদিগকে আসন্ন মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মসমাজে একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। বৰ্ত্তমান সময়ে খুলনার দুর্ভিক্ষে তাঁহারই যত্নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সেখানে সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিয়া অসহায় নরনারীর সাহায্য করিতেছেন। আর কত দৃষ্টান্ত দেখাইব? একটী তৃণ কি মত্ত হস্তীকে বন্ধন করিতে পারে? অনেকগুলি একত্র হইলে সেই কার্য্যটী সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। তাই আমি এই তিনটী ব্রাহ্মসমাজের পূজনীয় ও শ্রদ্ধেয় উপাসকদিগকে সবিনয়ে এই অনুরোধ করি যে, তাঁহারা বৰ্ত্তমান সময়ে নিজ নিজ মতের গণ্ডি হইতে বহির্গত হইয়া, সমবেত চেষ্টার সহিত সাধারণ দুস্থ নরনারীর সেবার জন্য একটী "অনাথ দাতব্য ভাণ্ডার" স্থাপন করুন। ইহাতে তিনটী সমাজেরই গৌরব হইবে। আমি কাহারও মতের উপর হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না; তাঁহারা চিরদিন তাঁহাদের

মতের গণ্ডির ভিতর থাকুন। তবে বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের যে প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বড় ইচ্ছা হয়, তাঁহারা একবার ব্রহ্মের অনন্ত পরিষ্কার বায়ুতে পরিভ্রমণ করেন।

যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের বিষয় চিন্তা করিয়া আমি শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগকে কয়েকটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কিন্তু এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমি কাহারও নিকট হইতে প্রত্যাশা করিয়া লিখিতেছি না। তাঁহারা কেবল এই "অতীতের ব্রাহ্মসমাজ" পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া আপন আপন মনকেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন।

১ম। বর্ত্তমান সময়ে কি জন্য লোকে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বা প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করেন না ?

২য়। বর্ত্তমান সময়ে প্রচারক বা অ-প্রচারক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্ম পরিবার সকলের ভিতর গিয়া সৎপ্রসঙ্গ, কীর্ত্তন ও উপাসনা দ্বারা তাঁহাদিগকে সজাগ রাখেন না কেন ? (ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান সমাজের প্রচারক বা অ-প্রচারকদিগের মধ্যে এ প্রকার সহানুভূতি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় ; অন্য সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন ?)

৩য়। কি জন্য বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের উপাসকদিগের ভিতর প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম দেখিতে পাওয়া যায় ?

৪র্থ। অতীতের উপাসকদিগের সাধনার ন্যায়, বর্ত্তমান সময়ে উপাসকদিগের মধ্যে সাধনা দেখিতে পাওয়া যায় না কেন ?

৫ম। বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থপরতা ও ভোগবিলাসিতা-রূপ দুইটী কীট ব্রাহ্মসমাজের মূলে প্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে ক্ষত এবং সেই ক্ষত বিষাক্ত আকার ধারণ করিয়া, একটু একটু ব্যাপ্ত হইয়া, উপাসকগণকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত, করিতেছে কি না?

৬ষ্ঠ। বর্ত্তমান সময়ে উপাসকদিগের মধ্যে আত্মদৃষ্টির এত অভাব হইয়াছে কেন?

সকলে আমার এই কয়েকটী প্রশ্ন, ভাল করিয়া অতীতের সঙ্গে তুলনা করিয়া, দেখিবেন।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের আগের কথা,—এক সময়ে আমার দীক্ষা-গুরু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আমার জীবনের উন্নতির জন্য একটী মন্ত্র সাধনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মন্ত্রটী এই, "সর্ব্বদা আত্মচিন্তা করিয়া নিজের দোষ অনুসন্ধান করিবে। পরের দোষ দেখিবে না, বা পরচর্চ্চা করিবে না। যদি পরের দোষ কখন দেখিতে পাও, বন্ধুভাবে বিনয়ের সহিত তাঁহাকে জানাইবে।" সর্ব্বদা সতর্ক না থাকিলে এই মন্ত্রটী সাধনা হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এ প্রকার সাধনা আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

মানুষ যখন ব্রহ্মসাধনাদ্বারা তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া তাঁহাতে রমণ করেন, তখন সেই সাধক দলাদলি ও অসার মতামত হইতে কি প্রকারে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ থাকিয়া, সমদৃষ্টিতে সকলকে দর্শন করেন, তাহার একটী নিদর্শন আমি প্রায় ৪২ বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি-দেবের ভিতর দেখিয়াছিলাম। যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে কতকগুলি উপাসক পৃথক হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, তখন একদিন ভক্ত

উমেশচন্দ্র আমাকে সঙ্গে লইয়া মহর্ষিদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় ঘটনাসকল তাঁহার নিকট দুঃখ করিয়া নিবেদন করিলেন। মহর্ষিদেব কোন পক্ষ সমর্থন না করিয়া স্থির, গম্ভীর ও অবিচলিতভাবে ভক্ত উমেশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ উমেশ, এই সঙ্কটের সময় একটী কথা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমরা central point অর্থাৎ মধ্যবিন্দু ব্রহ্মকে ছাড়িও না ; তাহা হইলে সকলকে এক স্থানে দেখিতে পাইবে, পার্থক্য ভাব তোমাদের মধ্যে থাকিবে না"। মহর্ষিদেব ব্রহ্মসাধনার ফলে তাঁহার জীবনে কি প্রকার সামঞ্জস্য দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক সাধককে আদর্শরূপে ধারণ করিতে অনুরোধ করি। আত্মচিন্তা ও ব্রহ্ম-সাধনার অভাবেই বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের ভিতর এ প্রকার অসমদর্শিতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মানবহৃদয় কখন অপূর্ণ থাকে না ; হয় প্রেম, ভক্তি ও সচ্চিন্তা, না হয়, অপ্রেম, অভক্তি ও অসচ্চিন্তাতে ইহা পূর্ণ থাকিবেই থাকিবে। সেই জন্য আত্মচিন্তা দ্বারা হৃদয়স্থিত দোষসকল দর্শন করিয়া, তজ্জন্য ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের উত্থানের পথ আর দেখিতে পাই না। আমি বাল্যাবস্থায় ভক্ত দাশরথি রায়ের একটী সঙ্গীত সর্ব্বদা গান করিতাম ; কিন্তু তাহার অর্থ তখন কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না। পরে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যখন আমার জ্ঞান একটু একটু বিকশিত হইতে লাগিল, তখন এই সঙ্গীতটি আমার পূর্ব্বাপেক্ষা বড়ই ভাল লাগিতে লাগিল। তৎপরে আমার গুরুদেব ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রটী যখন ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল, তখন ইহা আমার জীবনে একটা সাধনার ভাব জাগ্রত করিয়া

দিয়াছিল। ভক্ত দাশরথি রায় কি প্রকার আত্মচিন্তা দ্বারা নিজের দোষ স্বীকার করিয়া, তৎপরে তাঁহার ইষ্টদেবতার নিকট এই সকল দোষ হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি পাঠ করিলে সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন :—

"দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্ব-খাত সলিলে ডুবে মরি, শ্যামা।
ষড়রিপু হ'ল কোদণ্ড-স্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র-মাঝে কাটিলাম কূপ ;
সে কূপ বেড়িল কাল-রূপ জল, কাল মনোরমা।
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণ-ধারিণী, বিগুণ করেছে সগুণে ;
কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথির অনিবার বারি নয়নে ;
ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনের জীবন কেমনে
হয় মা রক্ষা।
আছি তোর অপিক্ষে, (মা গো) দে মা মুক্তি ভিক্ষে,
কটাক্ষেতে করি পার।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা আত্মচিন্তাবিহীন হইয়া, ব্রহ্মসাধনা হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে পড়িতেছি কি না, সকলে জাগ্রত ভাবে চিন্তা করুন। যেথানে উৎপত্তি সেথানে নিবৃত্তির চিহ্ন দর্শন করিলে, কাহার প্রাণে না আঘাত লাগে? তাই, বর্ত্তমান মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকদিগের নিকট এই প্রার্থনা, তাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের কল্যাণের জন্য সরল প্রাণে, ব্যাকুলতার সহিত, ব্রহ্মচরণে প্রার্থনা করুন। ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

প্রার্থনা

হে ব্রহ্ম, তোমার ভক্তগণের নিকট তোমার নাম শুনিয়া, তোমার ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম। তুমি, তোমার অতীতের ব্রাহ্মসমাজ-রূপ উদ্যানে, তিনটী বস্‌রাপী গোলাপফুল ফুটাইয়াছিলে; একটীকে ত দেখি নাই, অপর দুইটীকে দেখিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের সহবাসে নবজীবন লাভ করিয়াছিলাম। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ডবল বেল ও ডবল জুঁই ফুল তোমার এই উদ্যানে ফুটাইয়াছিলে। অতীতে তোমার এই উদ্যানটি কি সৌন্দর্য্য না ধারণ করিয়াছিল! পবন যখন তোমার এই উদ্যানস্থিত প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভ, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বহন করিয়া, বঙ্গদেশের নগরে, গ্রামে ও পল্লীতে নরনারীর প্রাণে বিতরণ করিয়া সকলকে উন্মত্ত করিয়াছিল, তখন তাঁহাদের অভূতপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার মানসে, তোমার এই উদ্যানস্থিত প্রস্ফুটিত পুষ্পের মধু আহরণের জন্য মত্ত মধুমক্ষিকার ন্যায় দলে দলে এই মহানগরীতে আসিয়া, সেই মধু পান করিতে করিতে অনেকেই সংসারের সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, তোমাকে পাইবার আশায়, তোমাতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। হে পরব্রহ্ম! তোমার এই প্রস্ফুটিত ফুলগুলির পত্র ও পাপ্‌ড়ী একে একে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতির সৌরভ এখনও হৃদয় মনকে পুলকিত করিতেছে। হে ভক্তহৃদয়বাসী লীলাময় ব্রহ্ম! অতীতে ভক্তদিগের ভিতর তোমার লীলা দেখিয়া জীবনকে ধন্য করিয়াছিলাম এবং

তাঁহাদের সহবাসে নবজীবন লাভ করিয়াছিলাম। আর কি সে লীলা ব্রাহ্মসমাজে দেখাইবে না?

হে পরব্রহ্ম, তোমার ব্রাহ্মসমাজে মধ্যবর্ত্তী সময়ে কত বড় বড় চিকিৎসক, বড় বড় কবি, বড় বড় সাহিত্যিক, বড় বড় দার্শনিক ও বড় বড় জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আসিয়া যোগ দিলেন বটে; কিন্তু কৈ ইঁহাদের মধ্যে মহর্ষিদেব, ব্রহ্মানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ, প্রতাপচন্দ্র, শিবনাথ প্রভৃতির ন্যায় একটীকেও তোমার ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যের পথপ্রদর্শক করিলে না! তোমার এই উদ্যানে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ জন্মিল বটে; কিন্তু এই সকল বৃক্ষে একটা কুঁড়ি পর্য্যন্ত ধরিল না,—এমন কি বেল জুঁই পর্য্যন্ত ফুটিল না! ইহাতে কি প্রাণে আঘাত লাগে না? হে দেব, অতীতের ন্যায় প্রেমভক্তির আদান প্রদান তোমার ব্রাহ্মসমাজে দেখিতে পাই না কেন? তোমার এই ব্রাহ্মসমাজরূপ তরীখানিতে দাঁড় আছে, হাল আছে, পাল আছে; কিন্তু পালে সুবাতাসের অভাবে, হালে হালী অভাবে, মাঝিরা তোমার এই নৌকাখানি কোন্ দিকে লইয়া চলিয়াছে, তাহা তুমি একবার দেখ। আমরা নিজ নিজ দোষে তোমার অতীতের ভক্তগণের প্রদত্ত মহামূল্য জিনিষসকল হারাইতে বসিয়াছি। আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া সজাগ করিয়া দাও। আমাদের দম্ভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ও বিলাসিতা সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, তোমার সাধনার পথ তুমি নিজে দেখাইয়া দাও। তুমি না দেখাইলে আর কে দেখাইবে? আমাদের কল্যাণের জন্য একজন সমদর্শী নেতা তোমার ব্রাহ্মসমাজে আনিয়া দাও, যিনি সমভাবে আমাদের

অন্তরে প্রবেশ করিয়া অতীতের দাগ সকল মুছিয়া দিয়া, সকলকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া, একটী স্থানে তোমার পূজার আয়োজন করিতে সক্ষম হইবেন। হে যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ব্রহ্ম, তোমার নিকট প্রার্থনা ভিন্ন আমাদের আর কি আছে? তুমি ব্রাহ্মসমাজকে পুনঃ নবতর বিধানে গঠন করিয়া, অতীতের ন্যায়, প্রেমভক্তির নবধারা তোমার ব্রাহ্মসমাজে প্রবাহিত কর। সেই দৃশ্য আবার দেখিয়া আমরা প্রাণ জুড়াই। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এই আমার অন্তরের প্রার্থনা।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

সমাপ্ত